দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

জন্মদ্বিশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি :
হিন্দু জাতীয়তাবোধের
উদ্‌গাতা রাজনারায়ণ বসু
— পৃঃ ৩৫

হিন্দু জাতীয়তাবোধের জনক
ঋষি রাজনারায়ণ বসু
— পৃঃ ৪৩

৭৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ২৩ নভেম্বর, ২০২৬।। ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com



आरोग्यम 108

CONDUCTS



a 108 Hours of Religious, Historical & village tour (अनुभव दर्शन) every week

108 minutes

Light and Sound Laser show on (काल गणना) daily at 8pm



108 minutes

Yoga & Meditation in Herbal Gardens (औषधीय नक्षत्र वाटिका) before Sunrise



108 minutes

Bhajan BonFire in Winter Nights



18 minutes

Geeta Paath | Rain Dance in Summer noon
Splash in Swimming Pool | Horse Riding
Camel Riding | Colourful Dance by 18 girls
Helicopter Ride of 108 Villages

अतिथि देवो भवः

has international quality facilities, with a team of

108+108

well trained young Rajasthani staff to look after the guests



has a

- Helipad
- sufficient Car Parking Space with e-Charging facilities,
- Banquet Hall
- 18 Guest Rooms
- Restaurant
- Swimming Pool
- Rain Water Harvesting
- Solar Power System.

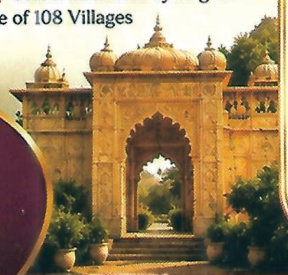

Chatarpura,
Kotputli, Rajasthan
(near Sariska Wildlife Sanctuary)

99037 18791

oprawat108@gmail.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ৬ অগ্রহায়ণ , ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৩ নভেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

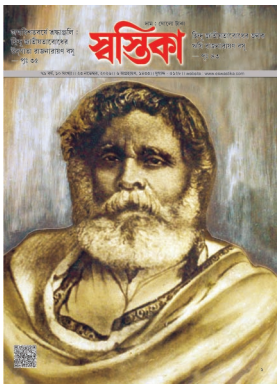

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈরাজ্যবাদী বিরোধীর 'দায়িত্বশীল বিরোধী' হয়ে ওঠার 'নিউ নর্মাল' হওয়া উচিত হাজতবাস : 'যম আছে পিছে' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

গুটেনবার্গ-এর মুদ্রণযন্ত্র থেকে আজকের মুদ্রণযন্ত্র ভারতের সংবাদপত্রের প্রথম দিশারি 'হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট' ☐ সংকর্ষণ মাইতি ☐ ৭

রাজনীতির ঊর্ধ্বে শিক্ষা—প্রাচীন ভারত থেকে নতুন পথের সন্ধান ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১১

অবশেষে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অ্যানাইটা ব্রিজেটি পাফ ☐ ডাঃ মধুসূদন পাল ☐ ১৪

অন্ধকার পেরিয়ে বস্তারে উন্নয়নের দীপশিখা ☐ দিগন্ত চক্রবর্তী ☐ ১৬

রাজনারায়ণ বসু : ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ ☐ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ☐ ১৭

স্বাজাত্যভিমানের পুরোহিত ও প্রচারক ঋষি রাজনারায়ণ বসু ☐ রাজদীপ মিশ্র ☐ ১৯

হিন্দুমেলার প্রেরণাপুরুষ ঋষি রাজনারায়ণ বসু ☐ মহেন্দ্রনারায়ণ দাস ☐ ২০

কাশী-বারাণসী : কালের একই তটে জীবনের আরতি ও অমৃতের আরাধনা ☐ ড. জয়দেব বিশ্বাস ☐ ৩১

নবান্ন শুধু উৎসব নয় : এক জীবনদর্শন ☐ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ ☐ ৩৩

জন্মদ্বিশতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা রাজনারায়ণ বসু ☐ ড. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩৫

বিকশিত ভারতের স্বার্থে দেশের যুবসমাজকে টেনে তুলতেই হবে ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ৪১

হিন্দু জাতীয়তাবোধের জনক ঋষি রাজনারায়ণ বসু ☐ ড. অয়ন ব্যানার্জী ☐ ৪৩

লাল সন্ত্রাসের শরশয্যায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ : ঋষি রাজনারায়ণ বসু ☐ ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ☐ স্মরণে : ৫০

প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর ২০২৬

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি

এই বছরের শুরুতে বাংলাদেশে নতুন সরকার শপথ গ্রহণের পর সেই দেশের জনসাধারণের দাবিদাওয়া পূরণ-সহ নানা সমস্যা সমাধানে ক্রমশই অপারগ হয়ে উঠেছে সেই সরকার। দেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশের পর একাধিক স্থানে বোমা বিস্ফোরণ-সহ যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় প্রতিবেশী দেশের এই শোচনীয় অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষ পূর্ণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name :

SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্ব-বোধ জাগরণের প্রেরণাপুরুষ ঋষি রাজনারায়ণ বসু

নাগপুরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিজয়াদশমী উৎসবের ভাষণে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত উল্লেখ করিয়াছেন, বিগত শতবর্ষ যাবৎ সঙ্ঘ যে কার্য সাধন করিয়া চলিয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে জাতির স্ব-বোধ জাগ্রত করিবার প্রয়াস। সঙ্ঘ স্থাপনার বহু পূর্বেই বহু মহাপুরুষ এই কার্য করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সঙ্ঘ স্থাপনার শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গপ্রদেশে এই কার্যে জীবনপণ করিয়াছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় নবজাগরণের তিনি অন্যতম চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক তথা ভারতের জাতীয় জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। ইহার জন্যই তাঁহাকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন, ১৮৪০-এর দশকে কলিকাতায় হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিবিরোধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে খ্রিস্ট জীবনযাত্রার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মদ্যপান ও উগ্র আধুনিকতায় দিশাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবককুলের অবস্থাও তাঁহারই ন্যায় হইয়াছিল। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মোহভঙ্গ ঘটিয়াছে। তাহার পর তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় সমাজকে স্বীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু বৎসরের পরাধীনতা বিশেষ করিয়া ইংরাজ শাসনে জাতির সর্বনাশের দিকটি তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই বোধেই তিনি জাতির স্ব-বোধ জাগরণের জন্য নিরন্তর নানাবিধ প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, স্ব-বোধ ত্যাগ করিলে বা অবজ্ঞা করিলে কোনো জাতি কোনো কালেই উন্নত হইতে পারে না। সেই স্ব-বোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালি জাতির মনে স্ব-ভাষা, স্ব-বেশভূষা এবং স্ব-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা। পরবর্তীকালে এই সভা হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া হিন্দুমেলা এবং ভারতবর্ষের স্বদেশি আন্দোলনের বীজ রোপিত হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিল। মেদিনীপুরে জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সহিত তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। যুব সমাজকে কুব্যসনাদি হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য তিনি মদ্যপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এতদ্বিধ পরিকল্পনা ও প্রয়াসের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে 'ঋষি' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে তিনিই স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন।

পাশ্চত্যের অন্ধানুকরণ পরিত্যাগ করিয়া ঋষি রাজনারায়ণ বসু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে প্রত্যাবর্তন করিবার মানসে যে মহাযজ্ঞের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, দেশের স্বাধীনতার পর দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। জাতির জীবনে স্ব-বোধ জাগরণের যে বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, আধুনিকায়ন, পাশ্চাত্য-ঘেঁষা উন্নয়ন মডেল এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ তাহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাইয়াছিলেন। সেই কারণেই স্বাধীনতার পর বহু দশক জাতি হীনম্মন্যতার শিকার হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিগত শতবর্ষ যাবৎ স্ব-বোধ জাগরণের দীপশিখাটি অনির্বাণ রাখিবার কার্যটি করিয়া চলিয়াছে। ফলস্বরূপ বহু দশক পর ভারত তথা ভারতবাসী পুনরায় জগৎ সভায় সম্মানের সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহারই কারণে বাঙ্গালি জাতিও সম্প্রতি পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে।

সুভাষিতম্

সুকুলে যোজয়েৎ কন্যাং পুত্রং বিদ্যাসু যোজয়েৎ।
ব্যসনে যোজয়েচ্ছত্রুং মিত্রং ধর্মেণ যোজয়েৎ।।

অর্থ ঃ কন্যার বিবাহ সৎকুলে দিতে হবে, পুত্রকে ভালোভাবে শিক্ষিত করতে হবে, শত্রুকে বিলাসব্যসনে মত্ত রাখতে হবে এবং বন্ধুদের ধর্মের পথে রাখতে হবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈরাজ্যবাদী বিরোধীর 'দায়িত্বশীল বিরোধী' হয়ে ওঠার 'নিউ নর্মাল' হওয়া উচিত হাজতবাস

'যম আছে পিছে'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

একজন দার্শনিক, ভাষাবিদ দাবি করেছিলেন--- 'লেখার চেয়ে ভাষা শক্তিশালী'। ২০১১ থেকে তোলাবাজি আর দুর্নীতি এই রাজ্যের 'নিউ নর্মাল' বা নতুন ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সেই 'নিউ নর্মাল'কে ভাঙার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যবাসী সবাই মিলে এটা উপলব্ধি করেছেন যে, গত ১৫ বছর ধরে তস্কর দল পরিচালিত সরকার এরাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর তোলাবাজির সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই বছর ৪ মে-র পর এরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কোনো সরকার দুর্নীতি ও তোলাবাজির ইস্যুকে সামনে তুলে ধরে তাকে দমন করার ঘোষণা করেছে। 'ব্যতিক্রমী সরকার' হয়ে ওঠার পরিচয় তারা দিচ্ছে। গত ৪ মে-র পর রাজ্যের শাসক দলের বশংবদ হয়ে ওঠার চেষ্টায় থাকা লোকজন অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লে, তারাও আইনের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে তাঁদের শপথের কথা দলীয় নেতৃত্ব সোচ্চারে ঘোষণা করছেন। রাজ্য সরকার কতটা তা পারছে তার তুল্যমূল্য বিচার পরে হলেও এটা নিশ্চিত করে এখন বলা চলে যে, রাজ্যকে পিছিয়ে দেওয়ার এই দুই কুনীতি ভাঙার জন্য কাউকে রেয়াত করা হচ্ছে না।

২০১১-২০২৬ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে ক্যামাক স্ট্রিট পর্যন্ত দুর্নীতির এক অশুভ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল। আর রাজ্য জুড়ে তার বলয়। মন্ত্রী বা নেতা হলেই যে সর্ববিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায় এমন দাবি ঠিক নয়। সর্বজান্তা হওয়ার ভান করা যে উচিত নয়— এমন দাবি রাজ্যের প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে শোনা গিয়েছে। কেন যাবে না? দার্শনিক জোসেফ ব্র্যাডলি বলে গিয়েছিলেন--- 'ইয়োর স্টেশন অ্যান্ড ডিউটিজ' অর্থাৎ তোমার এলাকা আর তোমার কর্তব্য এটাই স্বতঃসিদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাই যথার্থ বলেছেন— কথা কম কাজ বেশি। বাতিল হয়ে যাওয়া তস্কর নেত্রী আর তার ভাইপো সেনাপতি বহু অপরাধ করলেও কোনোদিন জেল খাটেননি বা আটক হননি। তবে সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন তাদের ফাটক যাত্রা নিশ্চিত হয়ে যাবে।

অনেকে ভেবেছিলেন লজ্জাজনক পরাজয়ের পর তস্কর দলের অপরাধপ্রবণ নেতৃত্ব শুধরে যাবেন। বেহায়ার নাহি লাজ বা অপমান! সুজন তারা কোনোদিন ছিলেন না। তাই সে আশা বাতুলতা মাত্র। তাদের এক কুচো সেনাপতির সাম্প্রতিক আস্ফালন তার প্রমাণ। এই মুহূর্তে দেশের বিরোধী পক্ষের অনেক নেতা সরকারি রোষে পড়ে জেল খেটেছেন এরকম উদাহরণ প্রায় বিরল। একটা সময় বলা হতো জেলের ভাত না খেয়ে কেউ রাজনীতিতে আসতে পারে না। সে ধারণা অনেকটাই পালটে গিয়েছে তার কারণ যাদের জেলে থাকার কথা— তাদের বেশিরভাগ প্রতিনিধি নিয়োগ করে দুর্নীতির কাজ চালায়। তারা সরাসরি যুক্ত থাকে না। ফলে দুর্নীতি-দমনের কায়দাও পালটেছে। তাই কোনো বড়ো নেতা, আমলা বা রাজনীতিবিদ সরাসরি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এরকম প্রমাণ পাওয়া কঠিন।

পি. চিদম্বরম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালীন বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা বড়ো ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হন। সুযোগ বুঝে তিনি তার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন। ইদানীংকালে বহু রাজনৈতিক নেতা জেল না খেটেই 'নেতা' হয়ে গিয়েছেন। এটা অবশ্য নয় যে, জেল না খেটে নেতা হওয়া যায় না। তবে বিদেশি সিপিএমের জমানায় যাদের গ্রেপ্তার হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল— তারা কেউ গ্রেপ্তার হননি।

রাজ্যের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিন কোনো বিরোধী আসনে না বসেই বিরোধী নেত্রীর তকমা জোগাড় করে ফেলেছিলেন। ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়ে প্রায় সাড়ে তিন দশক এরাজ্যের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখলেও তার বহু নাটুকেপনার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বিদেশি বামেদের সরে যেতে হয়। যে দলের হাত ধরে আর সাহায্য নিয়ে তিনি এরাজ্যে ক্ষমতায় আসেন সেই পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেসের নেত্রী তার ব্যক্তিগত জীবনীতে তাকে তেমন কোনো ঠাঁই দেননি। সম্প্রতি খানিকটা অর্থহীনভাবেই আধপোড়া একটি ব্যক্তিগত জীবনীকে রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে রাজ্য আর দেশজুড়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে। ওই বইতে যা লেখা আছে— পালটে যাওয়া রাজনৈতিক সময় আর সামাজিক বাতাবরণের পরিবর্তনের নিরিখে তার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই। গ্রন্থটি পড়ে এই প্রতিবেদকের অন্তত তাই উপলব্ধি হয়েছে। বইটি পড়া যেতে পারে কিন্তু তার মানে উদ্ধার করে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া সময় অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যারা কোনোদিন বই কিনে পড়তেন না— তারাও এই বই কিনে বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে শুরু করেছেন। পালাবার পথ না থাকলে যম তার পিছু নেয় বলে প্রবাদ রয়েছে। যিনি একদিন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসে পড়েছিলেন— তিনি এখন তার কবলে বলে মনে হচ্ছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)



‘যদি সংবিধান খারিজ হয়, মানুষ দাসত্বে পতিত হয়, একজন সাহসী মানুষ আর একটা স্বাধীন সংবাদপত্র তাদের উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে মস্ত বীরপুরুষও স্বাধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।’— জেমস অগাস্টাস হিকি

গুটেনবার্গ-এর মুদ্রণযন্ত্র থেকে আজকের মুদ্রণযন্ত্র

ভারতের সংবাদপত্রের প্রথম দিশারি ‘হিকি’জ বেঙ্গল গেজেট’

সংকর্ষণ মাইতি

মুদ্রণযন্ত্র (ছাপাখানা) উদ্ভাবনের পর প্রথম বইপত্র ছাপা হয়। এরপর সংবাদপত্র। মুদ্রিত সংবাদপত্রের আগে কি কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো? হতো, তবে পত্রের মাধ্যমে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে রোম থেকে যাঁরা দূরে বসবাস করতেন তাঁরা নিয়মিত রোমের নানা ঘটনা জানতে পারতেন পত্রের মাধ্যমে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে রোমানসম্রাট জুলিয়াস সিজার ওই পদ্ধতির উন্নতি ঘটান। প্রতিদিন তাঁর সরকার থেকে ‘ফেরাম’-এর প্রকাশ করা হতো। নাম ছিল ‘আক্টাডিউরানা’। অর্থ— দৈনিক ঘটনাপঞ্জি।

(জুলিয়াস সিজারের আর একটি কাজ—রোমানদেবতা জানুসের নামানুসারে যে ‘জানুয়ারি’ শব্দটি হয়েছে, সেই ‘জানুয়ারি’কে বছর শুরুর দিন হিসেবে চালু করেন তিনি ৪৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। পরবর্তীসময়ে গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার ‘খ্রিস্টাব্দ’ চালু করেন খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা। খ্রিস্টাব্দ হলো যিযুখ্রিস্টের জন্মের স্মরণে পরিগণিত অব্দ। খ্রিস্টাব্দতে প্রথম মাস হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে জুলিয়াস সিজার প্রবর্তিত ‘জানুয়ারি’ মাসটিকে। ১ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষের শুরু অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের শুরু। এবং আন্তর্জাতিক হিসেবনিকেশ চলে ইংরেজি ক্যালেন্ডার মেনে।)

জুলিয়াস সিজারের পর দীর্ঘসময় অতিবাহিত। কাগজ অনাবিষ্কৃত। ভারতে পুঁথিপত্র লেখা হয়েছে হয় তালপাতায়, নয়তো ভূর্জপত্রে (ভূর্জপত্র ভোজ গাছের পাতা, ছাল)। কাগজ আবিষ্কারের পর মানুষ কাগজে হাতেলেখা পুঁথিপত্র প্রকাশ করেছেন। তবে তা প্রসারে সীমাবদ্ধতা। চাই এমন যন্ত্র যা থেকে হাজার হাজার কাগজপত্র ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে, আবার সেগুলি মানুষের হাতে পৌঁছে যাবে।

১৪৫০ সালে জার্মানির মেন্‌জ শহরের একজন স্বর্ণকার জোহান্স গুটেনবার্গ টিন, অ্যান্টিমনি ও সিসার মিশ্রণে হরফ তৈরি করেন। ওই সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রও তৈরি করেন। তিনিই মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানার জনক। তাঁর পঞ্চাশ বছর আগে চীনদেশের পি শেং নামে এক ব্যক্তি পোড়ামাটির মুভেবল টাইপ আবিষ্কার করেছিলেন। আবার কোরিয়ার ব্রোঞ্জের হরফ বা টাইপ তৈরি হয়েছিল পি শেং-এর তৈরির পরে। তবে চীন ও কোরিয়ায় টাইপ আগে তৈরি হলেও কার্যকরী হয়নি। গুটেনবার্গের তৈরি টাইপগুলি বেশ কার্যকরী। গুটেনবার্গের তৈরি মুদ্রণযন্ত্রকে ‘লেটার প্রেস’ বলা হয়েছে। তিনিই লেটার প্রেসেরও জনক।

মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবনের পর বিভিন্ন স্থানে প্রথম বইপত্র ছাপা হয়। পঞ্চদশ শতকে, লন্ডনে ক্যাক্সটনের ছাপাখানায় উইক্লিফের ‘বাইবেল’ ছাপা হয়। এরপর জার্মানিতে লুথারের, ফ্রান্সে র‍্যাব্‌লে ও মহতঁর বইপত্র ছাপা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে শেক্সপিয়রের বইপত্র। এরপর বেকনের বইপত্র ছাপা হয়।

বিশ্বে কয়েকটি প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশের কথা জানা যায়।

১। অরেঞ্জ টাইমস—জোহান ক্যারোলাস, স্ট্রাসবার্গ (১৬০৫)। (স্ট্রাসবুর্গ)

২। লাগাসেত---ফ্রান্স (১৬৩১) ৩। আগাসেতা--পর্তুগাল (১৬৪৫) ৪। ইন্টেলিজেন্সার—লন্ডন (১৬৬৩) ৫। পাবলিক অকারেন্স—বস্টন (১৬৯০) এরপর বিশ্বখ্যাত সংবাদপত্রগুলির আত্মপ্রকাশ। বিশ্বে প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ নিয়ে বিতর্ক বা সংশয় রয়েছে। তবে প্রথম মুদ্রিত

সংবাদপত্রগুলি সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছে।

মূদ্রণ—লেটার প্রেস থেকে লাইনোটাইপ। ১৮৮৬ সাল। এই বছরে লাইনোটাইপ কম্পোজিংমেশিন আবিস্কৃত আমেরিকায়। 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন'-এর সম্পাদক রীড্ ১৮৮৬ সালে প্রথম লাইনোটাইপ কম্পোজিং মেশিন ব্যবহার করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোটারি প্রেস এবং কাগজ ভাঁজ করার যন্ত্রপাতি। এর ফলে ঘণ্টায় ২৪০০০০ খানা আটপাতার খবরের কাগজ ছাপা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে লেটার, লাইনোটাইপ প্রভৃতি মুদ্রণ ব্যবস্থা চলে আসে অফসেটে। এরপর মুদ্রণ ব্যবস্থায় জড়িয়ে গেছে কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন।

পরের ধাপে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংবাদপত্র প্রকাশে। নিমেষে খবরাখবর চলে আসছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। মুদ্রণযোগ্য তথ্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে একই জিনিস একই সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাপা হচ্ছে। আবার যুক্ত হয়েছে সিটিপি (কম্পিউটার টু প্লেট) টেকনোলজি। এর ফলে কম্পিউটার থেকে তথ্য সরাসরি প্লেটে নেওয়া হচ্ছে। আবার ব্যবহৃত হচ্ছে সিপিসি (কম্পিউটারাইজড প্রসেস কন্ট্রোল) যেখানে রঙের তারতম্য, কালির পরিমান কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির মেলবন্ধনকে বলে কনভার্জেন্স। সমকেন্দ্রাভিমুখতা? ১৯৯০-এর দশকে সম্ভবত কনভার্জেন্স-এর শুরু। সংবাদপত্রে রঙিন ছবির প্রকাশ ১৯৯০-এর দশকে।

১৯৯৩ সালের ৩০ জুন জলন্ধর (পঞ্জাব) শহর থেকে প্রকাশিত 'পঞ্জাব কেশরী'র (দৈনিক পত্রিকা) একটি করে কপি সাংবাদিকদের হাতে দেওয়া হয়েছিল পত্রিকার অফিস থেকে। (এই লেখকও ছিলেন) পঞ্জাব কেশরী পত্রিকায় ছোট্ট একটি রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে। এখন তো ডিজিটালের যুগ। সব কিছুই রঙিন। তবে সাদাকালো একেবারে ব্রাত্য হয়ে যায় নি।

* * * *

কাগজ আবিষ্কারের আগে ভারতে তালপাতায় ও ভূর্জপত্রে লেখা হতো। কলম তৈরি হয়েছে খাগগাছের নল দিয়ে। পরে পাখির পালক। কাগজ বাজারে আসায় কালি ও কলম পাল্টেছে। আগে চাল পুড়িয়ে কালি তৈরি হতো। পরে ট্যাবলেটের আকারে শুকনো কালির বটি, জলে বটি গুলে কালি তৈরি হতো। সরু মসৃণ কাঠের মাথায় নিবযুক্ত কলম, কালিতে নিব ডুবিয়ে কাগজে লেখা। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকেও কলমটি ব্যবহৃত। এরপর ঝরনা-কলম। ট্রেড্মাক সম্বলিত দোয়াত-কালি। এগুলি লেখালেখির উপাদান (এখন তো ডট্পেনের বাজার)। কাগজের ওপর লেখাগুলি স্থায়ী, মজবুত ও বহুবিস্তারের (সংখ্যায়) জন্য অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে। কী বইপত্র প্রকাশ, কী সংবাদপত্র প্রকাশ—উভয়ক্ষেত্রে অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে।

পর্তুগিজ শাসিত গোয়ায় মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার ১৫৫৬ সালে। তখন ভারতে ইসলাম শাসন। তবে তখন মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার ভারতে শুরু হয়নি। এরপর দু'শো বছর কেটে গেছে। মোগল শাসন অস্তমিত প্রায় 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে...'। ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন ক্ষমতার অলিন্দে। অনতিসময় পরেই শাসন ক্ষমতার হাতবদল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে (গভর্নর জেনারেল তখন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪—১৭৮৫) পুস্তক প্রকাশে পথ দেখান হুগলির শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। উইলিয়াম জোন্সের শিষ্য নাথালিয়া ল ব্রাসিহ্যালহেডের 'এ গ্রামার অব্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' পুস্তকটি প্রকাশ করেন তাঁরা ১৭৭৮ সালে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত। ইংরেজি গ্রামার পুস্তক হলেও এতে প্রথম বাংলা বিলে হরফের ব্যবহার করা হয়। অনেক বাংলা উদ্ধৃতিও রয়েছে। বাংলা হরফগুলি আঁকা ও খোদাইয়ের কাজ করেন চার্লস উইলকিনস এবং পঞ্চানন কর্মকার। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা পুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হন উইলিয়াম কেরি। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য' (১৮০১), 'কেরির কথোপকথন (১৮০১), গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র এবং চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তেতো ইতিহাস' (১৮০৫) প্রকাশিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। ১৮১২—১৮১৪ সালের মধ্যে বাংলা ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ৩৫২৩০ কপি—যার মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত ছিল। ১৮১৫—১৮২০ সালের মধ্যে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্রের সংখ্যা ছিল ১৭টি। ওই সময় পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার মুদ্রণের হরফ জোগান দিয়েছেন।

এতো গেল পুস্তক প্রকাশের কথা। কিন্তু সংবাদপত্র? ভারতে প্রথম পুস্তক প্রকাশ শ্রীরামপুর থেকে হয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশ কলকাতা থেকে। ১৭৬৮ সালে উইলিয়াম বোল্টস কলকাতায় মুদ্রণযন্ত্র বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সফল হননি। সফল হন এক আইরিশ যুবক। নাম জেমস আগাস্টাস হিকি। যুবকটি দুটো পয়সা রোজগার করতে কী না করেছেন। কখনো উকিলের ক্লার্ক, ছাপাখানার শিক্ষানবিশ, আবার কখনো নৌসেনার যোদ্ধা, জাহাজের চাকুরে। অস্থির মস্তিষ্ক। কোথাও থিতু হননি। অবশেষে ১৭৭৩ সালে কলকাতায়।

১৭৭২ সালে বঙ্গের গভর্নর হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল পদে তিনি। ওই সময় কলকাতার ভারতের রাজধানী হয়ে ওঠা।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বঙ্গের গভর্নর পদে বৃত। ১৭৭৩ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে রেগুলেটিং (নিয়ামক) অ্যাক্টপাস। এই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ। সেই অনুযায়ী মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পান বঙ্গের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস। গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৪ সালে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি কলকাতা প্রেসিডেন্সির কর্তৃত্বাধীন আসে। কলকাতা হয়ে যায় কোম্পানির ভারত-সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র, বলতে গেলে, ১৭৭৪ সালে কলকাতা হয়ে গেল ভারতের রাজধানী।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈতশাসনব্যবস্থা তুলে দেন। বিচারব্যবস্থার জন্য ১৭৭৪ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। প্রথম প্রধান বিচারপতি হন এলিজা ইপে (এলাইজা ইম্পি)। এরপর জেলাওয়ারি বিচারব্যবস্থা এবং কোর্ট নির্মাণ।

১৭৭৩ সালে কলকাতায় আসেন কাজের খোঁজে জেমস হিকি। কিছুকিছু কাজও করছেন। আবার মাথায় রয়েছে বড় কিছু একটা করার। টাকা ধার করে ছোট একটা জাহাজ কিনে ব্যবসাবাণিজ্যে নামেন। মাদ্রাজ থেকে কিছু

সামগ্রী নিয়ে কলকাতায় আসার পথে ঝড়-জলে মালপত্র নষ্ট। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ব্যবসায় নামা। সুবিধা করতে পারেননি। আবার দেনার মামলা কোর্টে। ক্রমশ মেজাজি হয়ে ওঠেন। এঁকে-ওঁকে গালাগালি দেন। কোর্টে মামলা ঠুকে দিয়েছেন নিজের উকিলও। জেল হয়ে যায় হিকির।

তখনকার নিয়ম ছিল জেলে থাকা আসামিদের নিজেদের খরচ নিজেদেরই চালাতে হবে। জেলে বসে আয় করতে হবে। কী করেন হিকি! কিছু একটা তো করতে হবে। হাজার দুই টাকা গচ্ছিত ছিল এক বন্ধুর কাছে। তা দিয়ে ছাপাখানার হরফ কেনেন। কাঠের মিস্ত্রি দিয়ে ছাপাখানা (মুদ্রণযন্ত্র) বানালেন। কাঠের মিস্ত্রি অর্থাৎ ছুতোর দিয়ে কী এমন ছাপাখানা তৈরি করলেন যা থেকে কাগজ ছাপা হবে? আসলে ছোটোখাটো কাজ, যেমন হ্যান্ডবিল, দলিল, বিজ্ঞাপন, বিমার দরখাস্তের ফর্ম প্রভৃতি কাজ শুরু করেন তিনি। অবাকচোখে অন্যান্য জেলবন্দিরা তাকিয়ে ওই সব কাজ করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন তিনি। রাত জেগে কাজ করেন, সফল হন। পয়সার মুখ দেখেন তিনি। ঠিক এই সময় এক হৃদয়বান উকিলের সাহায্যে দেনার মামলা থেকে রেহাই পান জেমস হিকি।

কলকাতার বুকে প্রথম ছাপাখানা বসিয়েছেন জেমস অগস্টাস হিকি। কম কথা! ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর জায়গাতে আগে জেলটি ছিল। এই জেলে হিকি ছাপাখানা বসান। শ্রীরামপুরে মিশনারিরা প্রথম ছাপাখানা বসিয়েছেন। অর্থবল, লোকবল রয়েছে। তাঁর ও ছাপাখানায় কর্মী রয়েছেন। ছাপাখানা চালনা তো একার কম্ম নয়। মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার সরকারের কাছ থেকে বড় বরাত পাওয়ার আশায় তিনি। ওবাবা খবর পান গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ঘনিষ্ঠ দু'জন দু'টি ছাপাখানা খুলে বসেছেন। বরাত পাচ্ছেন তাঁরা। দূর ছাই! ওপথে আর নয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এবার অন্য ভাবনা।

হিকি ঠিক করেছেন, এবার সংবাদপত্র বের করবেন। যেটাই ভাবেন, সেটাই করেন। কলকাতার ৬৭ নম্বর রাধাবাজারে ছাপাখানা বসান। ১৭৮০ সালের জানুয়ারি মংসে 'হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট' নামে সংবাদপত্রটি বের করেন। চার পাতার কাগজ। ইংরেজি

হিকি যেমন ক্ষমতাবান শাসকের দুর্নীতি নিয়ে নিজের সংবাদপত্রে কলম ধরেছেন, তেমন সংবাদ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও বারবার কলম ধরেছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। দাম এক টাকা। এই কাগজে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন ধরনের খবর ছাপা হয়। এই কাগজ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ইংরেজদের বিভিন্ন কেচ্ছাও হিকির কাগজে বেরোচ্ছে। ক্ষুদ্র চার পাতার কাগজ হলে কী হবে, ভারতের বাইরে আমেরিকায় এর প্রভাব পড়েছে। জেমস হিকি বুদ্ধিমান, কী করেছেন, আমেরিকানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমেরিকার একটি স্লোগান নিজের সংবাদপত্রে যুক্ত করেছেন। সংবাদপত্রের নামের নীচে স্লোগানটি রয়েছে।

'A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by none.'

আমেরিকানদের হাতে হিকির বেঙ্গল গেজেট পড়তেই তাঁরা খুবই উল্লসিত। যখন ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা কায়েম করতে চলেছেন ভারতে, তার অনেক আগে থেকে আমেরিকানরা লড়ছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার জন্য। সময়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে ইংরেজরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর বসাচ্ছে। নাগরিকরা খেপেছে। খবরটি হিকির কাগজ থেকে পেয়েছে আমেরিকানরা। শুধু কর নয় পক্ষপাতদুষ্ট অবিবেকী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে যুদ্ধে সর্বত্র জয় পাচ্ছে তা নয়, কোথাও কোথাও হারছে। হিকির বেঙ্গল গেজেট কাগজ থেকে ইংরেজদের পরাজয়ের খবর আমেরিকার কাগজগুলিও ছাপছে। আমেরিকানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছে, এদিকে ভারতীরাও লড়ছে। সময়কালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অস্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশক। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ১৭৭৪ সালে। ঠিক দু'বছর পরে আমেরিকার স্বাধীনতা সালটির (১৭৭৬) ঘোষণা হবে। যদিও ১৭৮১ সালে আমেরিকানরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আত্মসমর্পণ করেছে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে জর্জ ওয়াশিংটন। ইংরেজরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৭৮৩ সালে, কিন্তু ১৭৮৩ সালটিকে স্বাধীনতার সাল হিসেবে ধরা হয়নি। ধরা হয়েছে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই। (১৭৭৬ সালের জুন মাসে টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি রচিত হয়েছিল। গৃহীত ৪ জুলাই, ১৭৭৬। ২০২৬ আমেরিকার স্বাধীনতার আড়াইশো পূর্তি বছর। যাই হোক, আমেরিকা ছেড়ে ইংরেজরা পাকাপাকিভাবে ভারতে শাসন কায়েম করতে শুরু করে, শাসন নয়, শোষণ। অবিবেকী কাজকর্ম—যা হিকির কাগজে প্রকাশিত। সেদিনের সেই ছোট্ট কাগজে (ভারতের প্রথম সংবাদপত্র—'হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট) ইংরেজ শাসকের শোষন, কেলেঙ্কারি ছাপা হয়েছিল, যার জন্য গভর্নর জেনারেলের (ওয়ারেন হেস্টিংস) বিচার হয়েছিল খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। (ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচার শুরু)।

সংবাদপত্র কেমন হবে তার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন হিকি। শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়, অবিবেকী কার্যকলাপ থেকে তাঁর সংবাদপত্রের চরিত্রের রূপরেখাটি বেরিয়ে এসেছে।

তিনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন--- ব্রিটিশ-শাসনে সব নাগরিক কেন সমান বিচার পাবেন না? চিঠি জাল করেছিলেন দু'জনেই, রবার্ট ক্লাইভ আর মহারাজা নন্দকুমার। রবার্ট ক্লাইভের কিছুই হলো না। আর একজন ঝুললেন ফাঁসিতে। আইনের শাসন এই?

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হিকির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিলেন। পেটোয়া দুই সাহেবের কাগজ 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এর পোস্টেজ ফ্রি করে দেন, আর হিকির কাগজ

পোস্ট অফিস থেকে বিলি করা একেবারে বন্ধ করে দেন।

হিকি রেগে আগুন। আগে কোম্পানির দুর্নীতি ও কেচ্ছা নিয়ে দু'চারটি লেখা প্রকাশ করেছিলেন। পোস্ট অফিস থেকে তাঁর কাগজ বিলি বন্ধ হতেই আরও খেপে যান হিকি। এরপর তিনি কোম্পানির দুর্নীতি নিয়ে বাইশটা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে একুশটা, কোম্পানির স্বৈরতন্ত্র নিয়ে চুয়াল্লিশটা নিবন্ধ বের করেন নিজের কাগজ 'বেঙ্গল গেজেট'-এ।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রভাবের পরিচয় রাখেন। খবরের কাগজের স্পর্ধিত সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। সুপ্রিম কোর্টকে এড়াতে সদর দেওয়ানি আদালত খুলেছেন। ওই আদালতের মাথায় বসিয়েছেন এলিজা ইম্পেকে।

শাসক ও বিচারকের মধ্যে চুক্তি—'আপনি আমারটা দেখবেন, আমি আপনারটা দেখব।' 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। সততা, সত্যতা গোল্লায় যাক। ওয়ারেন হেস্টিংস এন্তার ঘুষ পাঠাচ্ছেন বিচারপতি এলিজা ইম্পেকে। তিনিও গ্রহণ করছেন।

১৭৮১ সালের ২ জুন ব্রিটানিকাস নামে একজন হিকির বেঙ্গল গেজেট-এ লিখেছেন—

'সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করবে, মানুষ সরকারকে মানবে। সেই শর্ত উপেক্ষিত বা লঙ্ঘিত হলে আনুগত্যের দায় থাকে না।'

ব্যস। খবরের কাগজে শাসকের সমালোচনা দেখে ওয়ারেন হেস্টিংস মানহানির মামলা করেন। কাগজের সম্পাদক হিকির জেল হয়ে যায়। বিচারপতি এলিজা ইম্পের বিরুদ্ধেও লেখালেখি। বিচারপতি ছাড়বেন কেন? বিচারপতি এলিজা ইম্পে হিকির জামিন ধার্য করেন চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। চল্লিশ হাজার পাউণ্ড! কোথা পাবেন হিকি চল্লিশ হাজার পাউণ্ড? মাথায় হাত। তবু জেল থেকে কাগজ বের করে চলেছেন হিকি। এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রতিশোধস্পৃহা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একের পর এক হিকির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকছেন। বিচারপতি এলিজা। ইম্পে হিকিকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। হিকি যে দণ্ডের অর্থ দিতে পারবেন না, এ বিষয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ও বিচারপতি এলিজা ইম্পে নিশ্চিত ছিলেন।

এবার অন্যপন্থী। হিকির বেঙ্গল গেজেট বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসকে ক্ষতিপূরণ দিতে হিকির ছাপাখানা নিলাম্ হয়ে যায়। ১৭৮৩ সালের ১০ এপ্রিল জেমস অগাস্টাস হিকির 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট' একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয়েছিল ১৭৮০ সালের জানুয়ারি মাসে, বন্ধ হয়ে গেল ১৭৮৩ সালের এপ্রিল মাসে।

ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না দোষ করলেই। স্বৈরতন্ত্রী শাসকের শোষন নিয়ে জেমস আগাস্টাস হিকি তাঁর সংবাদপত্রে তুলে ধরেছেন। যদি না তুলে ধরতেন তাহলে শাসকের স্বরূপ জনসমক্ষে আসতো না। ইতিহাস জেমস অগাস্টাস হিকিকে যেমন মনে রেখেছে তেমন দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদেরও মনে রেখেছে।

দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারপতি এলিজা ইম্পেকে দুর্নীতির দায়ে ইংল্যান্ডে 'রিকল' করা হয়। স্বৈরতন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে তাঁর বিচার চলে আট বছর।

পার্লামেন্টেই তাঁর 'ইমপিচ্‌মেন্ট' হয়। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন স্বৈরতন্ত্র ও দুর্নীতির অপবাদ নিয়ে বেঁচে ছিলেন। হিকির বেঙ্গল গেজেট বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ওই বেঙ্গল গেজেটে বেরোনো অভিযোগের ভিত্তিতেই এঁদের শাস্তি হয়েছে। হিকির অভিযোগের অস্ত্রই হলো তাঁর 'হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট।

বেচারা হিকিকেও ইতিহাস মনে রেখেছে। হিকির বয়স তখন সত্তরোর্ধ্ব। তিনি সর্বস্বান্ত, বান্ধবহীন। ভাগ্য ফেরাতে ভারত ছেড়ে চীনের পথে। দুর্ভাগ্য তাঁর, জাহাজে চড়ে চলেছেন। ভারত মহাসগের ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় জাহাজে অসুস্থ হয়ে মারা যান। লড়াকু ও সাহসী জীবনের অবসান ১৮০২ সালের অক্টোবর মাসে। মালাক্কা প্রণালীতে তাঁর মরদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

জেমস অগাস্টাস হিকির জীবনের গল্প লিখেছেন ওটিস। আবার তরুণ মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের (হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট) সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এঁরা।

হিকি যেমন ক্ষমতাবান শাসকের দুর্নীতি নিয়ে নিজের সংবাদপত্রে কলম ধরেছেন, তেমন সংবাদ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও কলম ধরেছেন—

'যদি সংবিধান খারিজ হয়, মানুষ দাসত্বে পতিত হয়, একজন সাহসী মানুষ আর একটা স্বাধীন সংবাদপত্র তাদের উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে মস্ত বীরপুরুষও স্বাধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।'

হিকির এই মূল্যায়নটি তাঁর পত্রিকায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

* * *

স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধান নির্মিত ও কার্যকরী হয়েছে। চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে ভারতের সংবিধান। চারটি স্তম্ভের একটি হলো সংবাদ। সংবাদই হয়ে গেল ভারতীয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তবে দায়িত্ব অনেক। যে কোনো মিডিয়া হোক না কেন, সংবাদ হবে সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক।

বিভিন্ন দেশে সত্যনিষ্ঠ সংবাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। তবে একেবারে কণ্ঠরোধ করা যায়নি। সংবাদপত্রে স্বৈরতন্ত্রী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছে। শাসককে বিচারের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিচার সকলের জন্য।

দেশের নাগরিকরা চান দেশের সুশাসন এবং সার্বিক উন্নয়ন। যে কোনো শাসকের সুশাসনের দিশা দেখাতে পারে একটি সংবাদপত্র।

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহিষাদল রাজকলেজের (অখণ্ড মেদিনীপুর) অধ্যাপক পীযূষবরণ চক্রবর্তী এই লেখককে বলেছিলেন, তিনি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে জেমস অগাস্টাস হিকির প্রকাশিত 'হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট'-এর একটি সংখ্যা দেখেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। জেলে গেলেন সম্পাদক---স্বাতী ভট্টাচার্য। আনন্দবাজার পত্রিকা। রবিবাসরীয়, রবিবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

২। কাগজের বই থেকে পর্দার বই—তৃষ্ণা বসাক। আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়, রবিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬।

৩। লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র —সংকর্ষণ মাইতি। সাপ্তাহিক আনন্দমেলা। ২২ নভেম্বর, ২০০০

৪। গুটেনবার্গ-এর ছবি এবং হিকি'জ বেঙ্গল গেজেট-এর (সাপ্তাহিক) একটি নমুনা সাপ্তাহিক আনন্দমেলা (২২ নভেম্বর ২০০০) থেকে সংগৃহীত।

রাজনীতির ঊর্ধ্বে শিক্ষা

প্রাচীন ভারত থেকে নতুন পথের সন্ধান

রাজনীতির কাজ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, শিক্ষার স্বাধীনতা রক্ষা করা; ও আরও গভীরভাবে বলা যায় যে, রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা মানে রাজনীতিশূন্য শিক্ষা নয়; রাজনীতির আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই শিক্ষার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধন কুমার পাল

শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করার কথা বলা যত সহজ , বাস্তবে তার প্রয়োগ তত সহজ নয়। কারণ আমরা একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে বাস করি, যেখানে শিক্ষা-নীতি প্রণয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামো নির্ধারণ, প্রশাসনিক সংস্কার কিংবা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ— সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভূমিকা রয়েছে।

তাই একটি মৌলিক প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই সামনে আসে— রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া যদি শিক্ষাব্যবস্থার কোনো বড়ো পরিবর্তন সম্ভব না হয়, তবে শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করা সম্ভব কীভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে— রাজনীতি থেকে শিক্ষা নয়, দলীয় স্বার্থ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে।

রাজনীতি শাসন পরিচালনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যখন শিক্ষা কোনো বিশেষ দলের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, যখন শিক্ষকতার পরিচয়ের চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয় বড়ো হয়ে দাঁড়ায়, যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত শিক্ষার প্রয়োজনের পরিবর্তে দলীয় সুবিধার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কোনো সরকার বা রাজনৈতিক শক্তির প্রতি মতাদর্শগত সমর্থন থাকলেও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষের প্রথম পরিচয় হওয়া উচিত তাঁর দায়িত্বের মাধ্যমে। একজন শিক্ষক আগে শিক্ষক; তাঁর রাজনৈতিক মত বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস তাঁর শিক্ষাদানের কর্তব্যকে কখনও অতিক্রম করতে পারে না। তবে এখানেও একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। যারা প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতি করেন না, কিন্তু কোনো বিশেষ জীবনদর্শন বা জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে একমত, তাঁরা সমাজের অন্যান্য মানুষের মতোই রাষ্ট্র ও শিক্ষার উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— তাঁর নিয়োগ বা দায়িত্ব পালনের মাপকাঠি যেন দলীয় আনুগত্য না হয়ে যোগ্যতা, সততা, কর্মদক্ষতা ও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা হয়।

সুতরাং, শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষা সম্পর্কে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বরং প্রকৃত অর্থে রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার জন্য একটি সাহসী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই প্রয়োজন--- এমন সিদ্ধান্ত, যেখানে ক্ষমতাসীন রাজনীতি নিজেই স্বীকার করবে যে শিক্ষার ক্ষেত্রকে দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে হবে। এখানেই রাজনীতির প্রকৃত মহত্ত্ব। রাজনীতি যখন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন শিক্ষা সংকুচিত হয়। কিন্তু রাজনীতি যখন নিজের ক্ষমতাকে সংযত করে শিক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, তখন শিক্ষার মুক্তি ঘটে।

তাই বলা যেতে পারে— শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করার প্রথম শর্ত রাজনীতির অবসান নয়; রাজনীতির আত্মসংযম।

আরও স্পষ্ট করে বললে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির হাত থেকে মুক্ত করতে পারে; কিন্তু দলীয় প্রভাব শিক্ষার উপর চাপিয়ে দিলে সেই সদিচ্ছাই তার অর্থ হারায়।

একটি সুস্থ গণতন্ত্রে রাজনীতির কাজ শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করা নয়— শিক্ষার স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং গুণগত মান রক্ষা করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

রাজনীতি পথ তৈরি করবে, কিন্তু শিক্ষার পথে চলার দিশা নির্ধারণ করবে শিক্ষা নিজেই।

এই ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেই সম্ভব হবে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে শিক্ষক রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়, তাঁর শিক্ষকতার আদর্শে পরিচিত হবেন; শিক্ষার্থী কোনো দলের ভবিষ্যৎ কর্মী হিসেবে নয়, স্বাধীন চিন্তাশীল ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষমতার প্রভাবকেন্দ্র নয়, জ্ঞান ও মানুষ গড়ার পবিত্র ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপরম্পরায় গুরুগৃহ, আশ্রম ও পরবর্তীকালের বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলি সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। রাজা-মহারাজারা শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতেন, পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন, কিন্তু জ্ঞানচর্চার নিজস্ব ক্ষেত্রের বিষয়টি স্বাতন্ত্র্য ছিল।

শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন— গুরু। রাজপুত্র হোক বা সাধারণ পরিবারের সন্তান— শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর কাছে শিষ্যত্বই ছিল প্রধান পরিচয়। রাজপরিবারের সন্তানদেরও শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য গুরুগৃহে পাঠানোর বহু উদাহরণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়। শিক্ষা শেষ করে কেউ রাজ্য পরিচালনায় ফিরে যেত, কেউ অন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করত; কিন্তু শিক্ষার সময় তার প্রথম পরিচয় ছিল— সে একজন শিক্ষার্থী।

এই ব্যবস্থার মধ্যে একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে। শাসনক্ষমতা এবং জ্ঞানক্ষমতা এক জিনিস নয়। রাজা শাসন পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানের সত্য নির্ধারণ করা তাঁর কাজ নয়। শিক্ষক বা গুরুর কাজ ছিল শিষ্যকে গড়ে তোলা— শুধু কর্মজীবনের জন্য নয়, জীবনের জন্য। অবশ্য প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে আজকের যুগে হুবহু ফিরিয়ে আনা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়— এমন কথা বলা যায় না। যুগ বদলেছে, সমাজ বদলেছে, শাসন পরিচালনার কাঠামো বদলেছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত একটি নীতি আজও অত্যন্ত মূল্যবান— শিক্ষার নিজস্ব মর্যাদা ও স্বাধীনতা থাকতে হবে; রাজনৈতিক ক্ষমতার ওঠানামার সঙ্গে তার মৌলিক চরিত্র বারবার পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়।

স্বাধীনতার পর ভারত বহু রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। গণতন্ত্রে সরকার বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক ও কাম্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিও কি প্রতিবার বদলে যাবে? একটি সরকার এক ধরনের ইতিহাসকে গুরুত্ব দেবে, অন্য সরকার অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনবে; এক সময় যে বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলা হবে, অন্য সময় তা উপেক্ষিত হবে— এইভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার্থী কোন্ ধারাবাহিকতার মধ্যে নিজেকে গড়ে তুলবে?

শিক্ষা কোনো রাজনৈতিক দলের পাঁচ বছরের কর্মসূচি হতে পারে না, শিক্ষা একটি জাতির দীর্ঘমেয়াদি সাধনা। বিশেষ করে ইতিহাসের শিক্ষায় এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয়রা দীর্ঘদিন এমন এক শিক্ষাপদ্ধতির উত্তরাধিকার বহন করেছে, যার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের সময়। সেই শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উপযোগিতা থাকলেও তার দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাও ছিল। ভারতের ইতিহাসকে অনেক সময় ভারতীয়ের নিজের চোখে দেখার পরিবর্তে বাইরের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— এমন অভিযোগ ও বিতর্ক দীর্ঘদিনের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার একটি বড়ো অংশ ছিল— শিক্ষাকে নিজের মাটি, প্রকৃতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দও ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানার কথা বলেছেন ও ভারতীয় সভ্যতার আত্মপরিচয় সম্পর্কে অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রশ্ন তুলেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, ইতিহাসকে কোনো একটি নতুন রাজনৈতিক মতের অনুকূলে সাজাতে হবে, বরং এর অর্থ— ভারতের ইতিহাস ভারতকে বাদ দিয়ে লেখা যাবে না। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বের ইতিহাস জানবে, অন্যান্য সভ্যতা জানবে, বিদেশের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন জানবে; কিন্তু নিজের দেশ, নিজের সভ্যতা ও নিজের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে নয়।

এখানেই আবার প্রথম প্রশ্নটি ফিরে আসে। শিক্ষাকে যদি দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হয়, তাহলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভূমিকা কী?

ভূমিকা রয়েছে এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ো সংস্কার সম্ভব নয়। নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগের স্বচ্ছ ব্যবস্থা, গবেষণার প্রসার, মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ, প্রযুক্তির ব্যবহার— এসবই দেশের নীতি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত।

কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়— শিক্ষার স্বাধীনতা ও গুণগত মান রক্ষা করার ব্যবস্থা তৈরি করা। এখানেই রাজনীতির প্রকৃত মহত্ত্ব। রাজনীতি যদি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রভাবের ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে চায়, তাহলে শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু রাজনীতি যদি সচেতনভাবে নিজের দলীয় প্রভাব থেকে শিক্ষাকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই শিক্ষার স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে।

তাই বলা যায়, শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করার জন্য রাজনীতির প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেই রাজনীতিকে শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করার লোভ থেকে বিরত হতে হবে। এটি কোনো বিরোধ নয়, বরং একটি পরিণত গণতন্ত্রের লক্ষণ।

শিক্ষার রাজনীতিমুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলির একটি হলো— শিক্ষককে তাঁর প্রকৃত পরিচয়ে ফিরিয়ে আসা। একজন শিক্ষক সমাজের একজন সচেতন নাগরিক। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মত থাকবে, সামাজিক মত থাকবে, দর্শন থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক সমাজে চিন্তার স্বাধীনতা সকলের অধিকার।

কিন্তু শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর প্রথম এবং প্রধান পরিচয়— তিনি একজন 'শিক্ষক'। তাঁর কাছে ছাত্র কোনো রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ সমর্থক নয়; সে একজন মানুষ, যার মধ্যে

সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে বিকশিত করাই শিক্ষকের কর্তব্য।

অতীতে এমন সময় ও পরিস্থিতির অভিযোগ আমরা শুনেছি, যখন শিক্ষার দায়িত্বের চেয়ে অন্য পরিচয় বা অন্য ব্যস্ততা বড় হয়ে উঠেছিল। কোনো ব্যবস্থাতেই এমন পরিস্থিতি শিক্ষার পক্ষে কল্যাণকর নয়। শিক্ষক যদি নিয়মিত শিক্ষাদানের পরিবর্তে অন্য কোনো পরিচয়কে বেশি গুরুত্ব দেন, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই শিশু, যে শিক্ষকের উপর নিজের ভবিষ্যতের জন্য নির্ভর করে রয়েছে।

শিক্ষক রাজনীতি করবেন কী করবেন না— সেটি ব্যক্তিগত ও আইনি অধিকারের প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের কর্তব্যের সময়ে শিক্ষকতার কোনো বিকল্প নেই।

এই নীতিটিই হওয়া উচিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।

এখানে আর একটি সূক্ষ্ম বিষয় বোঝা দরকার। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতি করেন না, কিন্তু একটি বিশেষ জাতীয় দর্শন, সামাজিক চিন্তা বা জীবনদৃষ্টির সঙ্গে একমত। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজসেবা বা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং করবেনও। কারণ মতাদর্শহীন মানুষ বলে কিছু হয় না। প্রত্যেক মানুষেরই জীবন, সমাজ ও দেশ সম্পর্কে কোনো না কোনো চিন্তা থাকে। সমস্যা মতাদর্শে নয়; সমস্যা তখনই, যখন যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যই একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

একটি সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মাপকাঠি হওয়া উচিত— যোগ্যতা, সততা, অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা এবং শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু সেই বিশ্বাসের কারণে শিক্ষার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া চলবে না।

শিক্ষা সকলের; তাই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কোনো একটি দলের সম্পত্তি হতে পারে না।

আজ 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' ভারতীয় শিক্ষাকে নতুনভাবে ভাবার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। এই নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক ও মতভেদ থাকতে পারে— গণতন্ত্রে সেটিই স্বাভাবিক; কিন্তু একটি বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা কঠিন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তা নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেও আধুনিক বিশ্বের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

শিক্ষা হবে আধুনিক, কিন্তু আত্মবিস্মৃত নয়। শিক্ষা হবে বিজ্ঞানমনস্ক, কিন্তু সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষা হবে বিশ্বমুখী, কিন্তু স্বদেশবিমুখ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষা এমন হতে হবে, যার মৌলিক দিশা প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে না।

সরকার আসবে, সরকার যাবে। শক্তিশালী গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু একটি জাতির শিক্ষার মূল লক্ষ্য— মানুষ গড়া, মেধাসম্পদ সৃষ্টি করা, চরিত্র গঠন করা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা। এই লক্ষ্য রাজনৈতিক পালাবদলের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।

এই কারণেই প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যার নীতিগত ভিত্তি জাতীয় ঐকমত্য, শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞতা এবং যা সমাজের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপরম্পরা থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি— ক্ষমতা জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের নিয়ন্ত্রক হওয়া উচিত নয়।

আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজাকে শাসন থেকে আলাদা করে দেখা যায় না, কিন্তু শাসনক্ষমতার চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আজ প্রয়োজন আরও পরিণত একটি ভাবনা; রাজনীতি শিক্ষার জন্য নীতি তৈরি করবে, সম্পদ দেবে, সংস্কারের পথ খুলে দেবে; কিন্তু শিক্ষার প্রতিদিনের জীবনকে দলীয় স্বার্থের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবে না।

সত্যিকারের রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা তাই রাজনীতির অনুপস্থিতি নয়, বরং এটি রাজনীতির একটি উচ্চতর দায়িত্ববোধ। রাজনীতি সিদ্ধান্ত নেবে শিক্ষাকে মুক্ত রাখার; শিক্ষা স্বাধীনভাবে মানুষ গড়ার কাজ করবে। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্যই ভবিষ্যতের পথ।

আজকের ভারতের সামনে তাই সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্মপরিচয় হারাবে না; যা ইতিহাসকে কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে না; যা নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানবে, আবার বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের কাছেও উন্মুক্ত থাকবে।

কারণ শিক্ষা কোনো সরকারের সম্পত্তি নয়। শিক্ষা একটি জাতির উত্তরাধিকার। আর একটি জাতির উত্তরাধিকারকে সাময়িক রাজনৈতিক লাভের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারাই হবে প্রকৃত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। তাই আজকের দিনের মূল কথা হতে পারে— রাজনীতির কাজ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, শিক্ষার স্বাধীনতা রক্ষা করা; ও আরও গভীরভাবে বলা যায় যে, রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা মানে রাজনীতিশূন্য শিক্ষা নয়; রাজনীতির আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই শিক্ষার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। □

শিক্ষা সকলের; তাই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কোনো একটি দলের সম্পত্তি হতে পারে না। এই নীতিটিই হওয়া উচিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।

অবশেষে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে অ্যানাইটা ব্রিজেটি পাফ

ডাঃ মধুসূদন পাল

ভারতবাসীর কাছে অ্যানাইটা পাফের পরিচয় : কোনো এক রহস্যজনক প্রক্রিয়ায় এমিলি শেঙ্কল কন্যা বিদেশিনি অ্যানাইটা ব্রিজেটি পাফ ভারতীয় হয়ে গিয়েছেন— অনিতা বসু পাফ। ১৯৬০ সালে শুধুমাত্র তরুণী অনিতাকে বিমানে চড়িয়ে ভারতে নিয়ে এসে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তার নিজের বাসভবনে এনে দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন— নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কন্যা হিসেবে। তখন অনিতার বয়স ১৭ কী ১৮ বছর। আশ্চর্যের বিষয় হলো নেহরু-প্রস্তাবিত নেতাজী কন্যাকে ভারতে আনা হলেও তার তথাকথিত মা এমিলি শেঙ্কলকে এদেশে আনা হয়নি কখনো। এমিলি কোনোদিনই ভারতে আসেননি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে প্রভূত যুক্তিসঙ্গত অবিশ্বাস রয়েছে। নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ খান কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে প্রবল জনমতের চাপে ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭০ সালে জাস্টিস খোসলা কমিশন তৈরি করতে হয়। তার ওপরে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে মামলা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায় কার্যকর করে কেন্দ্রীয় সরকার জাস্টিস মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। এতকিছুর মধ্যেও নেতাজীর তথাকথিত স্ত্রী ও কন্যাকে উপরোক্ত বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেশবাসী কখনো দেখেনি। তারা কখনো কোনো কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে আসেননি, বরং তারা নেহরু বা ইন্দিরা গান্ধীর বংশীর সুরে সুর মিলিয়েছেন বরাবর।

অনিতা পাফের আসল পরিচয় :



(১) ১৯৬০ সালে দিল্লি বিমানবন্দরের অফিসাররা অনিতা-র পাসপোর্টে পিতার নামের জায়গায়— 'কর্নেল পি ব্রিজেট' লেখা রয়েছে বলে দেখেছিলেন। এটাই তীব্র জনশ্রুতি।

(২) ১৯৭৯ সালে অনিতার আসল পরিচয় নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল, স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি লিখেছিলেন এই বলে যে, অনিতা প্রথমে ভারতে ছিল জওহরলাল নেহরুর বাড়িতে। নেহরুর বাসভবন জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা। এক বিদেশিনি সেখানে কিছুদিন ছিল। এ কারণে নিশ্চয়ই সেখানে তার পরিচয় সংক্রান্ত কিছু নথিপত্র অবশ্যই রয়েছে। সেগুলি তিনি দেখতে চান তাদের কাছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উত্তর দেয় যে, তাদের কাছে এ বিষয়ে এরকম কোনো নথি নেই। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ উত্তর দেয় তাদের কাছেও--- নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে বা কোনো কন্যা সন্তান জন্মের বিষয়ে কোনো নথি নেই।

(৩) ২০১৬ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভিয়েনাতে অবস্থিত ভারতের বৈদেশিক মিশনে অর্থাৎ দূতাবাসে এমিলি-অনিতা সংক্রান্ত যে ফাইলগুলি এতদিন ক্লাসিফায়েড হয়ে ছিল--- সেগুলোকে উন্মুক্ত (ডি-ক্লাসিফাই) করে দেয়। সেই দলিলগুলো থেকে পরিষ্কার যে, এমিলি তার সুদীর্ঘ বক্তব্যে নেতাজীর সঙ্গে তার বিবাহের সাল-তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলেনি। ভারতের ভিয়েনা দূতাবাসে এমিলি শেঙ্কল তার কন্যার জন্ম পরিচয়পত্র যা জমা দিয়েছে তা নিম্নরূপ—

কন্যার নাম অ্যানাইটা ব্রিজেটি শেঙ্কল 'Anita Brigitte Schenkl' (প্রশ্ন হলো— নামের মাঝে 'Brigitte' শব্দ কীভাবে এল?)

বাবার নামের কোনো উল্লেখ নেই।

মায়ের নাম এমিলি ক্যারোলিন শেঙ্কল, ভিয়েনাতে এক পোস্ট অফিসের কর্মী— 'Emilie Karoline Schenkl, employee of ...state post office'।

নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসু ও পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সুগত বসু-নিয়ন্ত্রিত নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো-র দেওয়া নথিতে তথাকথিত বিবাহের সাল কখনো ১৯৪২ সাল, কখনো ১৯৪১, আবার কোথাও ১৯৩৭ সাল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসু, সেজদা সুরেশচন্দ্র বসু ও ছোড়দা ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু চিরকাল এই বিবাহকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

অদ্ভুত বিষয় হলো— প্রায় সুদীর্ঘ আট দশক পরে অনিতা পাফের নাকি বিবেক জাগ্রত হয়েছে। এর আগে নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসুর পুত্র চন্দ্রকুমার বসু

জাপানের রেনকোজি মন্দির থেকে নেতাজীর তথাকথিত অস্থি ভস্ম ভারতে আনার দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন [কেস নম্বর— WPA(P). 581 of 2022]।

স্মরণীয় যে, নেতাজীর মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর মেজপুত্র অমিয়নাথ বসু ও তার পুত্র-কন্যারা, সবাই ছিলেন তাইহোকুতে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুকাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বসুর সেজপুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসু ও তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা সবাই বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর থেকে নেহরু ও ইন্দিরা অনুগত এবং তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কাহিনির প্রচারক।

তাছাড়া বোস-বাড়ির এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ছিল পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভিয়েনা-স্থিত ভারতের বৈদেশিক মিশনের অফিসে থাকা এমিলি-অনিতা সংক্রান্ত ক্লাসিফায়েড বা গোপন ফাইলগুলি যখন প্রকাশ করে দিল, তখন এই উভয় গোষ্ঠীর অস্তিত্বের সংকট দেখা দিল, তার কারণ এই দলিলসমূহ পরিষ্কার করে দিয়েছে এমিলি ও অনিতার কাহিনি কতখানি তৈরি করা এবং ভাঁওতা, মিথ্যাচার ও নোংরামিতে ভরা।

তারপরেই বিবদমান এই দুই গোষ্ঠী এক ধরনের সন্ধি বা সমঝোতায় আসতে যেন কিছুটা বাধ্য হলো। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হঠাৎ মিলন দেখা দিল এবং এখন অমিয়নাথের পুত্র-কন্যারা শিশির-গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীর ভাব স্থাপন করে নিয়েছে। গোপনে জোটবদ্ধ হয়ে ২০২২-এ তারাই আসে কলকাতা হাইকোর্টে এই আবেদনটি নিয়ে। অথচ এই আবেদনের যা সারমর্ম— তার বিরুদ্ধে অমিয়নাথ বসু ও পরবর্তী পর্যায়ে তার পুত্র-কন্যারা প্রকাশ্যে সরব ছিলেন দীর্ঘকাল। অমিয়নাথ বসুর পুত্র-কন্যা চন্দ্রকুমার বসু, সূর্যকুমার বসু, মাধুরী বসুদের দায়ের করা পিটিশনের পক্ষের উকিল হলো— কমরেড বিকাশ ভট্টাচার্য। এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে সিনিয়র অ্যাডভোকেট রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য এই লেখকের পক্ষ থেকে একটি কাউন্টার পিটিশন জমা করেন। এরপরই বাদীপক্ষ তাদেরই দায়ের করা মামলা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার আর কোনো তারিখ পড়েনি।

এবার সুপ্রিম কোর্টের কাছে দরবার : তিন বছর পর হঠাৎ দেখা গেল চন্দ্রকুমার বসুরা সুপ্রিম কোর্টে উদয় হয়েছেন এই একই আবেদন নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ যদিও আবেদনটি খারিজ করে দেয়।

তারপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন এক রায় মহাশয়। সম্ভবত উনি শরৎচন্দ্র বসুর কোনো এক কন্যার পুত্র। উনি একটি সংবাদমাধ্যমের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগের সাংবাদিক। সুপ্রিম কোর্ট তার দায়ের করা পিটিশনটিও খারিজ করে দিয়েছে। তারপর উদিত হয়েছেন ওই বিদেশিনি অনিতা পাফ। আবেদন সেই একই— জাপানের রেনকোজি মন্দির থেকে তথাকথিত অস্থি ভস্ম ভারতে নিয়ে আসতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'অ্যানাইটা ব্রিজেটি' বিবাহের পর হয়েছেন 'অ্যানাইটা ব্রিজেটি পাফ' (Anita Brigitte Pfaff)।

আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় তার সমস্ত কর্মক্ষেত্রে তার নাম হলো— অ্যানাইটা ব্রিজেটি পাফ, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের পোশাক পরে তিনি নাম নেন— 'অনিতা বোস পাফ', আর যখন কোথাও স্বাক্ষর করেন, তখন লেখেন— Anita B. Pfaff।

সুপ্রিম কোর্টের দায়ের এই পিটিশনেও [Writ Petition (Civil) No. 842 of 2026, Dated. 20 June, 2026] তিনি স্বাক্ষর করেছেন— Anita B. Pfaff।

এই মামলায় রেসপন্ডেন্ট পার্টি বা বিবাদী পক্ষ হচ্ছে— ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া তথা ভারত সরকারের ক্যাবিনেট সচিব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ও কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের সচিব।

ইতিমধ্যেই ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. কপিল কুমার এই মামলায় পার্টি বা অন্যতম পক্ষ হয়ে গিয়েছেন। অন্য অনেকে আরো অ্যাডেড পার্টি বা সংযুক্ত বিবাদী পক্ষ হতে পারেন। কলকাতা হাইকোর্টের পুরনো কেসের রেসপন্ডেন্ট পার্টিও সুপ্রিম কোর্টে অনিতা পাফের দায়ের করা এই মামলায় যুক্ত হতে পারেন। তারপর দেখা যাবে এই মামলার কী পরিণতি হয়।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে প্রণব মুখোপাধ্যায় ও অ্যান্তনিও মাইনো (সোনিয়া গান্ধী)-র রেনকোজি থেকে ছাই ভস্ম আনার দাম্ভিক চেষ্টা যেভাবে অবশেষে বুমেরাং হয়ে গিয়েছিল— সেই পরিণতির দিকে এই মামলাটি এগোচ্ছে না তো?

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা বা মুছে ফেলার কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে গত ১১০০-১২০০ বছর ধরে। মুসলমান শাসনের যুগে হিন্দু মঠ-মন্দির ধ্বংস, ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসকে বিকৃত করা, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব গৌরবময় চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করা আর কিছু কুৎসিত চরিত্রকে প্রোপাগান্ডা সহকারে 'মহানায়ক' বানিয়ে দেওয়া ছিল ব্রিটিশের পরিকল্পিত কাজ। সেই সুপরিকল্পিত চক্রান্তকে অনুসরণ করে জহরলাল নেহরু ও তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী ভারতের ইতিহাসের মহান চরিত্রগুলিকে কলঙ্কিত করার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। তার বড়ো উদাহরণ— (১) নেতাজীর বিবাহ কাহিনি তৈরি ও সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করা। (২) নেতাজী ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্টের পর যে জীবিত রয়েছেন, তিনি যে মহান কাজকর্ম করে চলেছেন তার ইতিবৃত্ত ধামাচাপা দেওয়া। (৩) রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর মিথ্যা কাহিনিকে প্রচার করে, তাকে ভারতের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার এক ভয়ঙ্কর নোংরা চেষ্টা।

এই ধরনের চক্রান্তগুলি সফল করতেই কমিউনিস্টদের হাতে ভারতের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেয় নেহরু ও ইন্দিরা সরকার। আর এই সমস্ত চক্রান্তকে সফল করার জন্য অ্যানাইটা ব্রিজেটি শেঙ্কল পাফকে ব্যবহার করা হচ্ছে। □

অন্ধকার পেরিয়ে বস্তারে উন্নয়নের দীপশিখা

দিগন্ত চক্রবর্তী

বস্তার একসময় মাওবাদ, হিংসা এবং দীর্ঘদিনের উন্নয়ন বঞ্চনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেখানেই জ্বলে উঠল আশার আলো। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বস্তারে প্রথম দীপাবলী উদ্‌যাপন করে নরেন্দ্র মোদী কেবল একটি উৎসবে অংশগ্রহণ করেননি, বরং দেশবাসীর কাছে এক গভীর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র মাওবাদী হিংসা ও বঞ্চনার শিকার হওয়া বস্তারের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক প্রকাশ ছিল তাঁর এই উপস্থিতি। একই সঙ্গে এই বার্তাও স্পষ্ট হয়েছে যে, বস্তারের মানুষও দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতো সমান সুযোগ, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অধিকারী।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে মাওবাদ ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার নামে এই চরমপন্থী সংগঠনগুলি সাধারণ জনজাতি মানুষদের হিংসা, ভয় ও জোরজবরদস্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। স্কুল, রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সরকারি পরিকাঠামো বারবার তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিশানা হয়েছে। যাদের অধিকার রক্ষার কথা বলে এই আন্দোলনের সূচনা, বাস্তবে সেই সাধারণ মানুষই বহু ক্ষেত্রে এর সবচেয়ে বড়ো শিকার হয়েছেন। একাধিক প্রজন্ম বড়ো হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। দেশের মূল উন্নয়নধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বাভাবিক অধিকারটুকুও তাদের কাছে অধরা থেকে গিয়েছে। তাই বস্তারের ট্র্যাজেডি কেবল একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে পরিকল্পিতভাবে বাধাগ্রস্ত করার ইতিহাস। যখন দেশের অন্যান্য অঞ্চল উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, তখন বস্তারের বিস্তীর্ণ এলাকা হিংসা ও অনুন্নয়নের চক্রে আটকে থেকেছে। মাওবাদের ক্ষতি শুধু নিরাপত্তারক্ষীদের প্রাণহানি কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থার ব্যাঘাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ফলে নষ্ট হয়েছে অসংখ্য স্বপ্ন, হারিয়ে গিয়েছে বহু শিশুর শৈশব এবং উন্নত ভারতের অংশীদার হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বহু সাধারণ পরিবার।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বস্তারে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি বামপন্থী চরমপন্থা মোকাবিলায় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকেও তুলে ধরে। একদিকে দৃঢ় নিরাপত্তা বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং নিরলস প্রচেষ্টা এমন পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যেখানে একসময় চরমপন্থীদের ভয়ে উন্নয়নের কাজ পৌঁছতে পারত না, আজ সেখানে ধীরে ধীরে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলছে। তবে কোনো জঙ্গি সংগঠনের প্রভাব কমে যাওয়াই সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন সাধারণ মানুষের মনে প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসবে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটি নাগরিকের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। বস্তারের মানুষকে শুধু হিংসার হাত থেকে রক্ষা করলেই চলবে না, নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের মধ্যে ভারতের হিন্দু দর্শনের একটি গভীর তাৎপর্যও রয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১.৩.২৮) বলা হয়েছে— 'ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে আমাদের নিয়ে চলো। এই মন্ত্র কেবল একটি আধ্যাত্মিক প্রার্থনা নয়, বরং অজ্ঞান, দুঃখ, দুর্দশা এবং হতাশা থেকে মুক্তির জন্য মানবসভ্যতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। বস্তারের মাটিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যেও এই প্রাচীন দর্শনের এক আধুনিক প্রতিফলন দেখা যায়। হিংসা থেকে শান্তির পথে, বঞ্চনা থেকে উন্নয়নের পথে এবং ভয় থেকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যেন এই আলোর উৎসবের মূল বার্তা। এখানেই হিন্দুত্বের সঙ্গে সমকালীন শাসনপরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সরকার কেবল হিন্দুত্বের কথা বলছে না, বরং এই চিরন্তন শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাবনাকে বাস্তব কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছে। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'— অর্থাৎ সকলেই সুখী হোক— এই আদর্শ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সমাজের একটি অংশও যদি নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনার মধ্যে দিন কাটায়, তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না।

বস্তারে দীপাবলী উদ্‌যাপনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'Diwali in Bastar... all thanks to our security forces! Naxalism is history. Development is the way ahead. Today was special and memorable.' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন নিরাপত্তা বাহিনীর আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়েছেন, অন্যদিকে বস্তারের ভবিষ্যৎ নির্মাণে উন্নয়নকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, বস্তারে দীপাবলী উদ্‌যাপনের গুরুত্ব শুধু একটি উৎসব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্য দিয়ে ভারতের ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা উঠে এসেছে। জাতীয় ঐক্য শুধু দেশের ভৌগোলিক সীমানা কিংবা প্রশাসনিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে না। দেশের প্রতিটি মানুষ যখন নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, যথাযথ সম্মান পান এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রায় নিজেদের সমান অংশীদার বলে ভাবতে পারেন, তখনই প্রকৃত জাতীয় সংহতি আরও শক্তিশালী হয়।

বস্তারের এই দীপাবলী শুধু অতীতের অন্ধকারকে পিছনে ফেলে আসার প্রতীক নয়, বরং আগামী দিনের এক নতুন ভারতের স্বপ্ন।



রাজনারায়ণ বসু

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

ভারতের মহাবিদ্রোহ পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু জাতীয়তাবোধের কেন্দ্রীয় শক্তি হয়েছিলেন মেধাবী সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু। বস্তুত বঙ্গীয় নবজাগরণ পর্বের অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজনারায়ণ। ইতালি-সহ ইউরোপে যে রেনেসাঁ হয়েছিল তার মূল কথা ছিল— লিবার্টি, ইকুয়ালিটি ও ফ্রেটারনিটি। রাজনারায়ণ বসু ব্রিটিশ ভারতে দাঁড়িয়ে স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাতে 'লিবার্টি' সুস্পষ্ট। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে তিনি স্বপ্নলব্ধ উপলব্ধির কথা লেখেন এভাবে— 'সে দিবস রাত্রে নিদ্রার পূর্বে বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম।....নিদ্রাযোগে এক স্বপ্ন দেখিলাম।...বোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং ইংরেজরা তথা হইতে চলিয়া গিয়েছে। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বছরের মধ্যে এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পূর্বে পৃথিবীতে কোনো দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর ইংল্যান্ড যে প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে।'

এখানেই শেষ নয়, দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা তাঁর কন্যা লীলাবতী মিত্রের 'দেওঘরে রাজনারায়ণ' নিবন্ধে' স্মৃতিকথায় পাই— 'গত বৈশাখ মাসে একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, দেখো কয়েকদিন হইল একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন পুরীতে গিয়াছি। সম্মুখে মস্ত এক পর্বত তাহার নীচেই সমুদ্র। সেই সমুদ্রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছি,আমার যে জগৎমাতা, তিনি কি এখানে? সেই স্থলে দাঁড়াইয়া আমি আমার জগৎ-মাতা কোথায় বলিয়া, মা মা করিয়া কাঁদিতেছি।'

ইংল্যান্ড তখন গোটা পৃথিবী শাসন করছে। ইংরেজ কবি টমসন গান ধরেছেন ব্রিটেন সমুদ্র তরঙ্গ শাসন করতে পারে 'Rule! Britannia! Rule the waves / Britannia never will be slaves.' সে সময় পরাধীন বঙ্গের এক দুঃসাহসী পণ্ডিত ব্রিটিশ শাসন অবসানের কথা ভাবছেন! রাজনারায়ণ বসুর এই স্বপ্ন তো আমাদের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়— 'মহেন্দ্রকে ব্রহ্মচারী দেবী প্রতিমা দর্শন করাচ্ছেন। প্রথমে দেখালেন, সর্বাভরণ ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি— মা যা ছিলেন। পরে অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালী— মা যা হইয়াছেন। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান— তাই মা কঙ্কালমালিনী। শেষে এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে সুবর্ণ-নির্মিতা দশভুজা প্রতিমা— মা যা হইবেন।'

'বন্দে মাতরম্'-এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাবোধের বীজ বপন করেছিলেন তা রাজনারায়ণের মধ্যে সুপ্রকট হয়। ব্রিটিশ ভারতে দাঁড়িয়ে নবজাগরণের অন্যতম মূল শর্ত লিবার্টির পক্ষে এমন মন্তব্য করা রাজনারায়ণ তাই জাতীয়তাবোধের পিতামহ হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন হিন্দু জাতীয়তাবোধে। মনে করতেন হিন্দু জাতীয়তাবোধই হলো ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। রাজনারায়ণের মধ্যেও একই মনোভাব সক্রিয় থেকেছে। ১৮৮৭ সালে গঠিত বিপ্লবীদের সংগঠন 'সঞ্জীবনী সভা'র তিনি ছিলেন সভাপতি। মনে রাখতে হবে, রাজনারায়ণ তখন অতি বিখ্যাত। সমগ্র দেশে তাঁর বিপুল পরিচিতি। রাজনারায়ণের স্পষ্ট কথা ছিল মৃত্যুর আগে দেশের অন্তত একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে হত্যা করতে পারেন তবেই জন্ম সার্থক। বলাবাহুল্য, পরাধীন ভারতে দেশের শত্রু ইংরেজ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। রাজনারায়ণের নাতি অরবিন্দ ঘোষও দাদুর সেই ঐতিহ্য বহন করে হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও বিপ্লবী শক্তির সহায়তায় মুক্তির উপায় বলে মনে করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ দেশকে নিছক একটি ভূখণ্ড বলে মনে না করে মৃন্ময়ী সত্তা বলে ভেবেছিলেন— রাজনারায়ণের ধারণা দ্বারা চালিত হয়েছেন। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্পর্কে রাজনারায়ণ মনে করতেন ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক তীর্থভূমি। বিপিনচন্দ্র পাল স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন খ্রিস্ট রিলিজিয়ন সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে। এ কথা শুনে রাজনারায়ণ বলেছিলেন ইংরেজরা ভারতীয়দের ধর্ম শেখাবে এ নিতান্তই এক হাস্যকর ব্যাপার। চিন্ময়ী ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ছিল তাঁর গভীরতম লক্ষ্য। বিশ্বাস করতেন হিন্দু জাতীয়তাবোধ। বর্তমানে ফেসবুক সর্বস্ব গোখাদক কমিউনিস্টরা হিন্দু জাতীয়তাবোধকে উদয়াস্ত গাল দেন। প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে দেওঘরের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবী শক্তির যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধায়। দেওঘরের উল্লেখ করা হলো কারণ রাজনারায়ণ জীবনের শেষ পর্যায়ে কাটিয়েছিলেন দেওঘরে।

১৮৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ২৬ বছর বয়সে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে

দায়িত্বভার নেন। বিপ্লবের পটভূমি মেদিনীপুরে তিনি জাতীয়তাবোধের শিক্ষার সূচনা করেছিলেন। যে জাতীয়তাবোধের জন্য তিনি গোটা দেশে বিখ্যাত তার সূচনা হয়েছিল 'ব্রিটিশদের হলদিঘাট' মেদিনীপুরে। তাঁর বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবীদের যে গুপ্ত সমিতি তৈরি হয়েছিল সেখানে তাঁর দুই ভাইপো জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শেই অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র তরুণ ক্ষুদিরাম বসুর মতো বিপ্লবীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় রাজনারায়ণ একটি প্রবন্ধে লেখেন—'Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives Of Bengal.'—এই লেখাটি নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত 'দ্য ন্যাশনাল পেপার'-এ প্রকাশিত হয়। নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন 'চৈত্রমেলা'র সূচনা করেন। চার বছর পরে নাম হয়— 'হিন্দুমেলা'। ১৮৭৫ সালে মেলার নবম অধিবেশনে রাজনারায়ণ সভাপতিত্ব করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা' সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে লেখেন— 'ভারতবর্ষকে— স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করেছিলেন। 'জাতীয়তাবোধ' ছিল এই মেলার লক্ষ্য। বিদেশি দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশীয় শিল্প ও পণ্য ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কুস্তি-সহ নানা শারীরিক চর্চার সূচনা করা হয়। রাজনারায়ণ মনে করতেন জাতীয় গৌরবের উন্মেষ ছাড়া কোন জাতি শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি মনে করতেন এদেশের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মানুষদের জীবন চর্চার অনুশীলন করা দরকার। নিজে ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও মনে করতেন মাতৃভাষা ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি মাতৃভাষার অস্মিতাকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয়তাবোধকে তীব্র করতে চেয়েছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও বলেছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মূল্যবান গ্রন্থগুলিকে এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজের উদাসীনতা তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন—'বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যার অনুশীলনের জন্য রাজার যে রূপ চেষ্টা করা কর্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।'

ব্রিটিশ ভারতে দাঁড়িয়ে, সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে এরকম অগ্নিস্রাবী বক্তব্য আসন্ন বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করেছিল।

১৮৯৩ সালে কলকাতায় বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার'। রাজনারায়ণ তখন দেওঘরে। তাঁকে প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি নাম এবং কার্যবিবরণী ইংরেজিতে লেখার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন। তাঁর অনুরোধ মেনে সংস্থার নাম হয় 'বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' পরে সামান্য সংস্কার করে নাম হয়— 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। এমন প্রখর ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনা। কলকাতায় হেয়ার সাহেবের স্মরণসভায় রাজনারায়ণকে আমন্ত্রণ করা হলে তিনি শর্ত দেন বাংলায় বক্তৃতা করবেন। 'বাংলা' তখন ছিল মধুসূদনের কথা অনুযায়ী ফিশারম্যানদের ভাষা। বাংলায় বক্তৃতা হবে শুনে চারদিকে চরম নিন্দামন্দের ঢক্কানিনাদ শোনা গেল। কিন্তু রাজনারায়ণ শেষ পর্যন্ত বাংলায় বক্তৃতা দিলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এই মহাপণ্ডিত বললেন— 'ইংল্যান্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য হইতেছে বটে, কিন্তু কী বিপরীত বিষময় ফলের উৎপত্তি হইতেছে! তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যাশিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতেছেন।' স্বদেশের নিন্দা তাঁর কাছে ছিল বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক শিষ্টাচারের সময় ব্রিটিশ স্টাইলের হ্যান্ড শেকের পরিবর্তে সনাতন ভারতীয় রীতি নমস্কার ও প্রণাম হলো শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেছিলেন ১ জানুয়ারির বদলে পয়লা বৈশাখ হবে নববর্ষের সূচনা উৎসব। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মতো উজ্জ্বল সনাতন সংস্কৃতিকে তিনি অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে নবগোপাল মিত্র শুধু হিন্দুমেলা নয় ১৮৭০-এ 'জাতীয় সভা' নামে একটি সংগঠন ও বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। 'জাতীয় সভা'র মাসিক অধিবেশনে ভারতীয় জমিদার ও প্রজাদের সম্পর্ক, এদেশীয় সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, মুদ্রাযন্ত্র, অঙ্কনবিদ্যা, শরীর চর্চা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। বলা নিষ্প্রয়োজন এই সমস্ত চর্চার মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতীয়দের হীনম্মন্যতা কাটানোর প্রচেষ্টাই ছিল সর্বাগ্রে।

রাজনারায়ণ গভীর শ্রদ্ধা করতেন স্বামী বিবেকানন্দকে। জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি দেওঘরে ছিলেন তখন নাতি অরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখিয়ে হিন্দু ধর্মের গৌরব ও বিস্তারে তাঁর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন। স্বামীজীর জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং স্বধর্মের প্রতি আস্থা তিনি দৌহিত্র অরবিন্দকে ব্যাখ্যা করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকায় ভারতে হিন্দুদের একত্রিত হয়ে মহাশক্তিতে পরিণত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জীবিত অবস্থায় তিনি বৃহৎ হিন্দু সংগঠন দেখে যাননি। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের অপমৃত্যু হয়নি। এ দেশে গড়ে উঠেছিল 'হিন্দু মহাসভা'। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তিনি জীবিত অবস্থায় দেখে গেছেন। আদ্যন্ত উপনিষদীয় চিন্তায় অভ্যস্ত রাজনারায়ণ বসু মনে করতেন ভারতবর্ষ হল এমন এক আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র যেখানে বেদান্ত দর্শন, হিন্দু ধর্ম আর ভারতবর্ষ সমার্থক।

জাতীয়তাবোধের মহান আদর্শ দ্বারা চালিত রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে যে বিপ্লবী চেতনার বীজ রোপণ করেছিলেন তা গোটা দেশে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। পিতামহ ভীষ্মের মতো ব্রিটিশ-বিরোধী আধুনিক মহাভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনিই হলেন ভারতীয় বিপ্লববোধের পিতামহ। □

স্বাজাত্যভিমানের পুরোহিত ও প্রচারক
ঋষি রাজনারায়ণ বসু

রাজদীপ মিশ্র

উনিশ শতকের বাঙ্গালি নবজাগরণের যাঁরা পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। Nation building at the grassroot level—এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

১৮২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার বোড়ালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নন্দকিশোর বসু কিছুদিন রামমোহন রায়ের সচিব ছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারি পদে কর্মরত ছিলেন। সাত বছর বয়সে শিক্ষার জন্য বাবা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ১৮৪০ সালে হেয়ার স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজি ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কলেজের পড়া শেষ করার পর ১৮৪৯ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৫১ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের (বর্তমানে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল) প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময় তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেন। সমাজে অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য তিনি আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। মেদিনীপুর জেলায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেয়েদের স্কুল, নিরক্ষরদের জন্য রাতের স্কুল এবং একটি গণ গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি গ্রন্ধাগার নামে পরিচিত। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় উদ্যোগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয়বোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের আগেই তিনি এই কাজের গোড়া পত্তন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সঞ্জীবনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় তিনি এই সমিতির একটি গোপন বৈঠক করেন। এই সমিতির মাধ্যমে দেশীয় পদ্ধতিতে দেশলাই কাঠি এবং দেশীয় তাঁতে বোনা কাপড় তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভার সঙ্গে যুক্ত হন। স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য নবগোপাল মিত্র স্থাপিত 'হিন্দুমেলা'তেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি হিন্দুমেলার সভাপতি হন। বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি অনেক শ্রোতাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসেবে ১৮৫০-এর দশকে তিনি বিধবা বিবাহকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। মদ্যপান মুক্ত সমাজ যাতে তৈরি হয় সে বিষয়ে তার উদ্যোগ ছিল প্রণিধানযোগ্য। সমাজ থেকে মদ্যপানের কুফল দূর করতে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ১৮৬০ সালে তিনি 'মদ্যপান নিবারণী সভা' গঠন করেন। ১৮৪৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি সংস্কৃত শেখেন এবং তাঁর অনুরোধে ও সহযোগিতায় তিনি কঠোপনিষদ, কোনোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ সাহিত্য ছাড়াও তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' এবং 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত'। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ব্রহ্ম সাধন', 'ধর্মতত্ত্ব দীপিকা', 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', 'সার ধর্ম', 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' প্রভৃতি।

রাজনারায়ণ বসু ন্যাশনাল সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার মধ্যে একটিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের কেন ইংরেজির উপর নির্ভর করতে হবে? তিনি বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চর্চার পক্ষে জোরালো সাওয়াল করেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন জাতীয় অগ্রগতির অনেকাংশ জাতীয় সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল, আর জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি তখনই সম্ভব যদি জাতীয় ভাষার বিকাশ হয়। পরে ন্যাশনাল সোসাইটির উদ্যোগে একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে জরিপ বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, সঙ্গীত, বন্দুক চালানো, অশ্বারোহণ এবং ব্যায়াম শেখানো হতো। 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' (১৮৭৩) গ্রন্থে তাঁর যুক্তি ছিল, হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারীর স্থান নেই। হিন্দুরা ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলে মনে করে এবং জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর উপাসনা করে। জীবনের শেষ পর্বে তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা পুনর্জীবিত করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই লক্ষ্যে 'An Old Hindu's Hope' (১৮৮৮) গ্রন্থে তিনি একটি মহা হিন্দু সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন।

কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের উনি একজন উকিলও ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর একদা ছাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, একদিকে তিনি যেমন সমগ্র জীবন ঈশ্বরের সেবায় নিবেদন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি দেশের উন্নতির জন্য নিরন্তর নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর পাণ্ডিত্য ও সাধনার জন্য তাঁকে 'ঋষি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে 'স্বাজাত্যভিমানের প্রথম পুরোহিত ও প্রচারক' বলে অভিহিত করেন। জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন কাজে তাঁর বিভিন্ন অবদানের জন্য তাঁকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ' বলা হয়। এই মহান পুরুষ ১৮৯৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। এই বছরটি তাঁর জন্মের দ্বিশত বর্ষ।

ফঃ ৩

হিন্দু মেলার প্রেরণাপুরুষ ঋষি রাজনারায়ণ বসু

মহেন্দ্রনারায়ণ দাস

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একদম শুরুর দিকে তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গের মনীষীগণও জাতীয়তাবোধের জাগরণে হিন্দুত্বের ভাব পুনর্জাগরণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। ওই সময়েই এক এক করে রচিত হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu Chemistry। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছিলেন Positive Sciences of the Ancient Hindus। পঞ্চানন ঘোষাল লিখলেন হিন্দু প্রাণী বিজ্ঞান। ড. বিভূতিভূষণ দত্ত লিখলেন History of Hindu Mathematics। প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দু কলেজ। কিন্তু বঙ্গের সাধারণ মানুষকে তাদের প্রাচীন জ্ঞান সম্পদ এবং হিন্দু জীবন পদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ধারণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছিল কর্মবীর নবগোপাল মিত্র দ্বারা 'হিন্দু মেলা'র স্থাপনা। রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, '...এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশীয় শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।' এই হিন্দু মেলা শুরু হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ বলা যায় কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দেশভক্তির প্রথম পাঠ হিন্দু মেলার এক অনস্বীকার্য অবদান।

এই হিন্দু মেলার প্রধান রূপকার হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন নবগোপাল মিত্র এবং তার সঙ্গে অবশ্যই তাঁর প্রধান সহকারী হিসেবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এই ভাবনার মূল উৎস ছিলেন নবগোপালের দীক্ষাগুরু মহাপ্রাণ রাজনারায়ণ বসু, যিনি তখন মেদিনীপুরের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মেদিনীপুরের 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' এবং কলকাতাতে 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালীন গুণীজনদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর নাম এই কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য জীবনে প্রথম জীবনে অভ্যস্ত হয়েও পরে বঙ্গের প্রথম 'সুরাপান নিবারণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। রাজনারায়ণ বসু উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে হিন্দু ধর্মের আবিলতা, যুক্তিহীনতা ও পুরোহিততন্ত্রের গড্ডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্রাহ্ম মত গ্রহণ করার পরেও 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' তার এক শ্রেষ্ঠ রচনা যেখানে তাঁর বক্তব্য 'হিন্দু ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরের স্মরণে করিবার বিধান লক্ষ্য করা যায়'। কারণ তার মতে 'ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা'। যে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান তিনি প্রার্থনা করেছিলেন তা জড়বাদ বা বিজ্ঞানবাদ দিয়ে বিশ্লেষণযোগ্য ছিল না, তা ছিল সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। আর ঠিক এই কারণেই তিনি Hindu-Revival-এর প্রথম দিকের প্রবর্তকের সম্মানটুকু ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। যে সময়ে শিক্ষিত যুবসমাজে, হয় ব্রাহ্মসমাজের অংশ হওয়া বা খ্রিস্ট মতে ধর্মান্তরিত হবার ঢল নেমেছিল সেই সময়ে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে রাজনারায়ণ বসুর আন্দোলন সত্যিই সেযুগে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ভারতপথিক রামমোহন রায়ের প্রীতিভাজন আপ্তসহায়ক নন্দকিশোর বসুর প্রথম পুত্র রাজনারায়ণ বসুর রচনায় ঊনবিংশ শতকের চিন্তার এক নিরপেক্ষ প্রতিফলন পাওয়া যায়। বালক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক রাজনারায়ণ বসুর চরিত্রের প্রভাব তাঁর 'প্রজাপতির নিবন্ধ' গল্পে চন্দ্রমাধব চরিত্রে, 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর চরিত্রে, রাজর্ষি গল্পে এবং 'জীবনস্মৃতি' পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। ছাত্রাবস্থায় Historian আখ্যা পাওয়া রাজনারায়ণ বসুর রচনার সিংহভাগই ইতিবৃত্তমূলক। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'সেকাল ও একাল' চিরকালীন রচনা রচনার সিংহভাগই ইতিবৃত্তমূলক। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'সেকাল ও একাল' চিরকালীন রচনা ও ঊনবিংশ শতকের বঙ্গ সমাজের নির্ভরযোগ্য ছবি। তাঁর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' অনেক তথ্যের আকর। মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ব্রহ্ম উপাসনার পর ব্রাহ্মদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, '...যে যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী সকল মহীতলে স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম, তাবৎ প্রকৃত হিন্দুধর্ম এই ভারত মণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে।' তিনি তাহাদের সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, 'এই প্রাচীন ঋষিরা তোমাদের পৈতৃক ধন। এই পবিত্র ধনকে তোমরা কখনো অবহেলা করিও না'। ব্রাহ্ম মত যে সমগ্র হিন্দু ধর্মেরই একটি পরিশীলিত রূপ এই ভাবটি এইভাবেই তিনি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু 'Prospectus of a society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত' করার জন্য কিছু প্রস্তাব দেন এবং কোনো সভা দ্বারা তাহা কার্যকর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার সেই প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল— ১. জাতীয় ব্যায়াম চর্চার পুনরুদ্দীপনার্থ সর্বতো রকম প্রচেষ্টা। ২. হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের স্থাপন করা। ৩. হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যালয়ের স্থাপনা যেখানে ভেষজ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা শেখানো হবে। ৪. ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনুসন্ধানলব্ধ সত্য সকল বাংলা ভাষায় পুস্তক আকারে প্রচার করা। ৫. সংস্কৃত ভাষা ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ৬. বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথোপকথন ও পত্রালাপ বাধ্যতামূলক করা। ৭. পোশাক পরিচ্ছদ, উৎসব ও প্রথা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদিতে জাতীয় ভাব আনয়ন করা ইত্যাদি।

রাজনারায়ণ বসুর এই সকল প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে জনসমক্ষে নিয়ে আসার এবং অভ্যাস করার জন্যই তাঁর ভাবশিষ্য নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা'র প্রবর্তন করেন যা সেই সময়কার সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। □



নয় মাসের গর্ভাবস্থা এক দিব্যযাত্রা

হাসি দাস

গর্ভাবস্থার নটি মাস একটি নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরিকল্পনার সময়। এই সময়ে মায়ের শারীরিক পরিবর্তন, গর্ভের শিশুর ক্রমবিকাশ, সঠিক পুষ্টি, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়াজনীয় সাপ্লিমেন্ট, টিকাকরণ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পরিবারের সহযোগিতা— সবকিছুর সমন্বয় একটি সুস্থ মাতৃত্বের ভিত্তি তৈরি করে। গর্ভসংস্কারের দৃষ্টিতে এই নয় মাসকে শুধু আধ্যাত্মিক বা আবেগের বিষয় হিসেবে দেখলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একজন গর্ভবতী মায়ের সুস্থ শরীর, সঠিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সহায়ক পারিবারিক পরিবেশ— এসবই গর্ভসংস্কারের বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাতৃত্বের পথচলা যতটা প্রকৃতির, ততটাই পরিচর্যার, আর সঠিক পরিচর্যাই এই যাত্রাকে করে তোলে আরও নিরাপদ।

প্রথম থেকে তৃতীয় মাস—সচেতনতার ভিত্তি

গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় অনেক মায়ের বমি বমি ভাব, বমি, ক্লান্তি, খাবারে অনীহা, গন্ধে অস্বস্তি বা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও গর্ভাবস্থার নিবন্ধন করানো উচিত। স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং ফলিক অ্যাসিড-সহ নির্ধারিত সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভাবস্থার প্রথম শিক্ষা হলো— লক্ষণকে অবহেলা নয়, সঠিক পরামর্শের মাধ্যমে তাকে বুঝে নেওয়া। এই সময় নির্ধারিত টিকাকরণের সময়সূচি স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী অনুসরণ করা জরুরি। পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ এবং বিশ্রামের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পরিবারের উচিত মায়ের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ না দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দৈনন্দিন পরিচর্যায় সহযোগিতা করা। মায়ের যত্ন নেওয়া শুধু একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়— এটি পরিবারের সম্মিলিত সচেতনতা।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মাস—পুষ্টি ও বিকাশের সময়

গর্ভাবস্থার চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মাসে ভ্রূণের বৃদ্ধি আরও দ্রুত হতে থাকে এবং মায়ের পুষ্টির চাহিদাও বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই সময়ে নিয়মিত এএনসি বা গর্ভকালীন স্বাস্থ্যপরীক্ষার মাধ্যমে মায়ের ওজন, রক্তচাপ, রক্তস্বল্পতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর নির্দেশ অনুযায়ী আয়রণ ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম-সহ প্রয়োজনীয় সাপ্লিমেন্ট নিয়মিত গ্রহণ করা জরুরি। পুষ্টি শুধু শরীরের চাহিদা পূরণ করে না, সুস্থ মাতৃত্বের ভিত্তিকেও শক্তিশালী করে।

খাদ্য তালিকায় শাকসবজি, ফল, জল, প্রেটিনসমৃদ্ধ খাবার এবং অন্যান্য সুষম খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পর্যাপ্ত নিরাপদ জল পান ও যথাযথ বিশ্রাম ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে সহযোগিতা করা। এই সময়ে মায়ের প্রতিদিনের যত্নই আগামী দিনের জন্য একটি সুস্থ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সপ্তম থেকে নবম মাস—প্রস্তুতি ও নিরাপদ প্রসবের পথ

গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে মা ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য ও সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এই সময়ে পরিবারকে নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রাখতে হবে। কোন্ হাসপাতালে প্রসব হবে, জরুরি প্রয়োজনে কীভাবে সেখানে পৌঁছানো হবে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও যোগাযোগের ব্যবস্থা কী থাকবে। প্রসবের প্রস্তুতি শেষ মুহূর্তে শুরু হয় না, সচেতন পরিবার আগে থেকেই তার পথ তৈরি করে রাখে।

রক্তপাত, পেটে তীব্র ব্যথা, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, অস্বাভাবিক ফোলা বা গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়া নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। পরিবারের উচিত এই সময় মায়ের শারীরিক ও মানসিক স্বস্তির দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া। সতর্কতা ভয়ের নাম নয়— সতর্কতা হলো নিরাপত্তার প্রস্তুতি।

নয় মাসের গর্ভাবস্থা একটি ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত পরিচর্যার সময়। প্রথম তিন মাসে পুষ্টি ও ভ্রূণের বিকাশ এবং সপ্তম থেকে নবম মাসে নিরাপদ প্রসবের প্রস্তুতি, প্রতিটি পর্যায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

গর্ভসংস্কারের দৃষ্টিতে এই পরিচর্যা শুধু মায়ের একার, ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়। এটি পরিবারেও সম্মিলিত দায়িত্ব। মায়ের সঠিক খাদ্য, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনের সময় দ্রুত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সচেতনাতা।

একটি নতুন জীবনের আগমনের প্রস্তুতি শুরু হয় যত্ন থেকে। আর সেই যত্নের প্রথম কেন্দ্রবিন্দু হলেন মা। তাই নয় মাসের এই যাত্রাকে শুধু অপেক্ষার সময় না ভেবে সচেতনতা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক সহযোগিতা এবং দায়িত্ববোধের একটি পূর্ণাঙ্গ পথ চলা হিসেবে দেখা উচিত।

নয় মাসের এই দিব্যযাত্রায় প্রতিটি সঠিক পদক্ষেপ শুধু একটি সুস্থ মাতৃত্বের দিকে নয়, একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। □

ব্রেন ফগের কবলে পড়েননি তো?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক



ব্যক্তি জীবনে মুঠোফোনের অবিরাম নোটিফিকেশন আর প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রের চাপে আমরা যেন ২৪ ঘণ্টা যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছি। কিন্তু কখনো কি এমন হয় যে, কোনো কাজ করতে গিয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে পারছি না? চিন্তাশক্তি যেন ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে। কিছু পড়ছেন, কিন্তু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে বা প্রিয় কারও নাম মনে করতে গিয়ে হঠাৎ আটকে যাচ্ছেন? চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থাকেই বলে 'ব্রেন ফগ'। এটি কোনো একক রোগ নয়, বরং উপসর্গ, মানসিক স্বচ্ছতা ও মনোযোগের অভাবের একটি সংকেত।

ব্রেন ফগ আসলে কী?

ব্রেন ফগ হলে মস্তিষ্ক স্বভাবতই তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। ফলে প্রতিদিনের কাজগুলিও মনে হতে থাকে কঠিন। এর সাধারণ কিছু লক্ষণ হলো—

মনোযোগের তীব্র অভাব : দীর্ঘক্ষণ কোনো একটি কাজে মন বসানো কঠিন হয়ে পড়ে। অফিসের কাজ হোক বা ঘরের কোনো হিসেব, বারবার খেই হারিয়ে ফেলেন।

সিদ্ধান্তহীনতা : ছোটখাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেও হিমশিম খেতে হয়। যেন মস্তিষ্ক কোনো সমাধানই দিতে পারছে না।

স্মৃতিশক্তি হ্রাস : অতি সম্প্রতি করা কোনো কাজ বা পরিচিত মানুষের নাম ভুলে যাওয়া। চাবি কোথায় রেখেছেন কিংবা জরুরি কোনো ডকুমেন্ট কোথায় রাখলেন, খুঁজে পেতে বারবার বেগ পেতে হয়।

মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি : সারাক্ষণ একধরনের অবসাদ অনুভব করা। শরীর বিশ্রাম পাওয়ার পরও যেন মস্তিষ্ক বিশ্রাম পাচ্ছে না, এমনটা মনে হতে পারে।

চিন্তার জড়তা : মনে হয়, মাথায় যেন কুয়াশা জমে আছে। কোনো তথ্য স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সমস্যা হওয়া বা দ্রুত কথা বলার সময় শব্দ খুঁজে পেতে দেরি হওয়ার সমস্যাও হতে পারে।

ব্রেন ফগ মূলত মস্তিষ্কের ওপর অতিরিক্ত চাপ বা দীর্ঘমেয়াদি অবহেলার সংকেত। এর পিছনের মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ : দীর্ঘমেয়াদি দুশ্চিন্তা মস্তিষ্কের 'অ্যামিগডালা' ও 'প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স'-এর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে। কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মস্তিষ্ক একধরনের 'সারভাইভাল মোড'-এ চলে যায়। ফলে সৃজনশীল বা যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা কমে আসে।

অপর্যাপ্ত ঘুম : ঘুম হলো মস্তিষ্কের মেরামতের সময়। ঘুমের অভাব হলে মস্তিষ্ক সঠিক ভাবে বিষাক্ত বর্জ্যগুলি অপসারণ করতে পারে না, যা ব্রেন ফগের প্রধান অনুঘটক।

পুষ্টির অভাব : মস্তিষ্কের স্নায়বিক কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন-ডি, আয়রন, ওমেগা-৩ ও ম্যাগনেশিয়ামের অভাব ব্রেন ফগ বাড়িয়ে দেয়।

ডিজিটাল ওভারলোড : সারাক্ষণ মুঠোফোন বা কম্পিউটারের নীল আলোর সামনে থাকা এবং সমাজ মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য গ্রহণ মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাকে ধীর করে দেয়।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা : থাইরয়েডের সমস্যা, রক্তাল্পতা বা হরমোনের পরিবর্তনের কারণেও মস্তিষ্ক কুয়াশাচ্ছন্ন হতে পারে।

জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস : অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার ও চিনিযুক্ত পানীয়র প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কের ওপর পড়ে। অতিরিক্ত চিনি শরীরে প্রদাহ তৈরি করে, যা স্নায়ুর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

প্রতিরোধের উপায় :

ডিজিটাল ডিটক্স : দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে দূরে থাকুন। বিশেষ করে ঘুমোনোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে ফোন ব্যবহার বন্ধ করুন।

সুষম খাবার ও পর্যাপ্ত জল : ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার (যেমন— সামুদ্রিক মাছ, আখরোট, চিয়া সিড) ও শাকসবজি খান এবং প্রচুর জল পান করুন। জলশূন্যতা ব্রেন ফগের অন্যতম কারণ।

নিয়মিত ব্যায়াম : শারীরিক ব্যায়াম মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, যা মনোযোগ ও মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করে। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়ামের অভ্যাস করুন।

মনোনিবেশ : প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট ধ্যানের অভ্যাস মস্তিষ্কের উদ্বেগ কমাতে দারুণ কার্যকর। এটি মস্তিষ্কের বর্তমান মুহূর্তে মনোনিবেশ করতে শেখায়।

একক কাজ : মাল্টিটাস্কিং বা একসঙ্গে অনেক ধরনের কাজ করার প্রবণতা বন্ধ করুন। একটি নির্দিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করলে মস্তিষ্কের ওপর চাপ কম পনে।

চিকিৎসকের পরিবর্তন আনার পরও যদি এ-লক্ষণগুলো না কমে বাড়তে থাকে, তবে তা অন্য কোনো রোগের সংকেত হতে পারে। যেমন বিষণ্ণতা, দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ বা স্নায়বিক কোনো জটিলতা। দীর্ঘদিনের স্মৃতিভ্রম বা দৈনন্দিন কাজে বড়ো ধরনের ব্যাঘাত ঘটলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ব্রেন ফগ একটি সতর্কবার্তা।

এটি মনে করিয়ে দেয় যে, মস্তিষ্কের পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সঠিক পুষ্টি এবং প্রশান্তি প্রয়োজন। জীবনযাত্রায় ছোটো ছোটো পরিবর্তন এনে আমরা আমাদের মস্তিষ্কের সচল ও কুয়াশামুক্ত রাখতে পারি। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু। □



ঠাকুরপুকুরে সমাজসেবা ভারতী-র উদ্যোগে ‘নবদুর্গা পূজন’



দুর্গাপূজার পবিত্র আবহে গত ২০ অক্টোবর মহানবমী তিথিতে সমাজসেবা ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান— ‘নবদুর্গা পূজন: জীবন্ত দুর্গার আরাধনায় মাতৃশক্তির আরাধনা’। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট্ট কন্যাদের মধ্যে দেবী দুর্গার নয়টি রূপের প্রতীকী প্রকাশকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পূজা করা হয়। মাতৃশক্তির আরাধনা, নারীশক্তির সম্মান এবং সমাজে কন্যাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বার্তা বহন করে এই মহতী উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সি প্রায় ১৫০ জন কুমারী কন্যা অংশগ্রহণ করে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগত এই কন্যাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আনন্দময় ও ভক্তিপূর্ণ। দেবী দুর্গার নয়টি রূপের প্রতীক হিসাবে কন্যাদের পূজনের মাধ্যমে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক সুন্দর প্রকাশ ঘটে।

হিন্দু শাস্ত্রীয় ও শাক্ত ঐতিহ্যে নারীকে আদ্যাশক্তির প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। সেই ভাবনাকে সামনে রেখে ‘নবদুর্গা পূজন’ কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং কন্যাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। প্রত্যেক কন্যার মধ্যে নিহিত সমূহ সম্ভাবনা, আত্মমর্যাদা ও শক্তিকে সম্মান জানানোই এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান বার্তা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা ভারতী-র প্রান্ত স্তরের কার্যকর্তারা। তাঁদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ-সহ ধর্মীয় আবহ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে এই কর্মসূচি সমাজে কন্যাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার বার্তা বহন করে। ‘যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ’ অর্থাৎ যেখানে নারীদের সম্মান করা হয়, সেখানে দেবতারা আনন্দিত হন। এই চিরন্তন ভাবনাকে হৃদয়ে ধারণ করে ‘নবদুর্গা পূজন’ সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নারী ও কন্যাদের সম্মান, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করাই প্রকৃত শ্রদ্ধার প্রকাশ। মহানবমীর পবিত্র লগ্নে সমাজসেবা ভারতী-র এই উদ্যোগ ভক্তি ও মানবিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধন হয়ে ওঠে। দেবী দুর্গার আশীর্বাদে প্রত্যেক কন্যার জীবন হোক সুন্দর, সুরক্ষিত, মর্যাদাপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়, নারীশক্তির জয় হোক, কন্যাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকুক— নবদুর্গা পূজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে এই প্রার্থনাই জানান।



সম্পন্ন হলো সংস্কৃতভারতীর সাত দিনব্যাপী ‘সংস্কৃত ভাষা প্রশিক্ষণ বর্গ’

সংস্কৃত ভাষার প্রচার, প্রসার ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহরে সগৌরবে সম্পন্ন হলো সাত দিনব্যাপী ‘আবাসীয় প্রবোধন বর্গ’। সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে হালিশহরের নিগমানন্দ আশ্রমে গত ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ আবাসিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের এই প্রবোধন বর্গে শিক্ষার্থী এবং সমগ্র শিবিরের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সদস্য মিলিয়ে মোট প্রায় ১৯০ জন উপস্থিত ছিলেন। এই আবাসিক শিবিরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৬ নভেম্বরের ‘সংস্কৃত ভাষার জাগরণ ও প্রসারের বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়। গত ৬ নভেম্বর বিকেল ৪টের সময় আয়োজিত হয় বর্গের সমাপন কার্যক্রম বা সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান সিলেবাস কমিটির দায়িত্বে থাকা দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন মন্ত্রী মাননীয় প্রণব নন্দ, নিগমানন্দ মঠের শ্রীমৎ প্রণব চৈতন্য মহারাজ এবং সংস্কৃভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অধ্যক্ষ ড. তন্ময় ভট্টাচার্য। পাশাপাশি প্রান্ত ও জনপদের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা কার্যকর্তারাও উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। সমাপন কার্যক্রমের শেষ পর্বে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতে গান, সুভাষিতম পাঠ, শিক্ষার্থীদের অনুভব কথন এবং আকর্ষণীয় নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে এই প্রবোধন বর্গের সমাপ্তি ঘটে।

সুভাষগ্রাম ক্রীড়াভারতীর প্রশিক্ষণ বর্গ



গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে ক্রীড়াভারতী (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর ক্রীড়া কেন্দ্র প্রমুখ, যোগাসন ও সূর্য নমস্কার প্রমুখদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৮০ জন এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি— ভারতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য, পদ্মশ্রী, অর্জুন ও ধ্যানচাঁদ পুরস্কারপ্রাপ্ত দৌড়বিদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার, ক্রীড়াভারতী (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সম্পাদিকা জয়ন্তী মণ্ডল, প্রান্ত ক্রীড়া কেন্দ্র প্রমুখ অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত যুব প্রমুখ শুভেন্দু সরকার-সহ ঘনশ্যাম চৌরসিয়া, কিরণ চৌরসিয়া, পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, কৌস্তভ ঘোষ, আশিস পাল প্রমুখ বরিষ্ঠ কার্যকর্তা।

বর্গে অ্যাথলেটিক্স, যোগাসন, সূর্য নমস্কার, ফুটবল, ক্যারাটে, সেল্ফ ডিফেন্স ও পারম্পরিক খেলাধূলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলে। গ্রামে গ্রামে ক্রীড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন সকল প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা



৪ ও ৫ নভেম্বর ২০২৬ পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় ২৮তম অ্যাথলেটিক্স ও আর্চারি প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকে রাঙ্গাডি-সাইবুড্ডি ফুটবল ময়দানে। মার্চ পাস্ট ও মশাল দৌড়ের মাধ্যমে একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রারম্ভ করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় পরম পূজ্যপাদ স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ চুনারাম মুর্মু, প্রান্ত সভাপতি পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম দক্ষিণবঙ্গ, সিনিয়র মেডিকেল অফিসার রঘুনাথপুর মহকুমা হাসপাতাল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিব শঙ্কর সিংহ মহাশয় দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কুচিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রধান বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমর পাল শারীর শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক হিন্দি হাইস্কুল ঝালদা, প্রান্ত খেল টোলির সদস্য দক্ষিণবঙ্গ, মহাদেব গড়াই ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক পূর্বক্ষেত্র কেন্দ্র কলকাতা কল্যাণ ভবন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুশীল সরেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক, বিষ্ণুচরণ মাহাতো দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত-সহ সংগঠন সম্পাদক, ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ মাহাতো, দক্ষিণবঙ্গ খেলকুদ প্রান্ত এবং অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানটি শ্রদ্ধেয় পরম পূজ্যপাদ স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভারম্ভ করেন। এর পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে চন্দনের ফোঁটা, ফুলের স্তবক, উত্তরীয় ও মেডেল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে ১৫টি জেলা থেকে (সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বেদিয়া, ওরাং) ৫ জনজাতির খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। পুরুষ খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল ১২৭ জন ও ৭ কিলোমিটার রোড রেসে ২৩ জনজাতি খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণকালীন কার্যকর্তা-কার্যকর্ত্রী ও ব্যবস্থাপক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে সমস্ত রকমের কাজে সহযোগিতা করেছেন ৯৩ জন। প্রতিযোগিতাতে মোট উপস্থিত সংখ্যা ৩১৫ জন। পূর্ণকালীন কার্যকর্তা-কার্যকর্ত্রী ও ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুব সম্মেলন ও বস্ত্র বিতরণ



গত ৮ অক্টোবর হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত পানিহিজলী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে সারাদিনব্যাপী যুব সম্মেলন ও বস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ৩০০ যুব ও শিক্ষকের উপস্থিতিতে '২০৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারত' বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মহিষাদল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মঠাধীশ স্বামী গৌতম মহারাজ ও স্বামী দেবানন্দ মহারাজ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিকশিত ভারত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ক্রীড়াভারতীর বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিকালে ৭০০ দরিদ্র মায়েদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। মায়েদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, দীর্ঘকাল পর পশ্চিমবঙ্গে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরাজ্যে মা-বোনেরা বর্তমানে সুরক্ষা ও সম্মান পেতে শুরু করেছেন। স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বহুদিন পর একটি রাষ্ট্রবাদী আদর্শে পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জেহাদিদের হাত থেকে হিন্দু মায়েরা সুরক্ষিত হচ্ছে। আগামীদিনে মায়েরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সেই বিষয়ে নবনির্বাচিত সরকার গুরুত্ব দেবে। হিন্দুসমাজকে সংগঠিত থেকে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের পাশে থাকার আহ্বান জানান পূজনীয় মহারাজ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সারাদিনব্যাপী কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সেবাকাজ

গত ১৩ অক্টোবর বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পক্ষ থেকে এক বিশেষ সেবামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। মানবিকতা ও সেবার আদর্শকে পাথেয় করে এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন'-এর বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে প্রয়োজনীয় রন্ধন সামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই মহতী কার্যক্রমটি



সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাঠচক্রের সদস্যরা এদিন বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের স্বপন কুমার ঘোষের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীতে পাঠচক্রের উপদেষ্টা অমরকৃষ্ণ ভদ্র তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ইতিহাস, প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও আদর্শগত ভিত্তির এক সুস্পষ্ট চিত্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেন। অতঃপর বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে সংগঠনের গৌরবময় অতীত, আদর্শনিষ্ঠ পথচলা এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তদুপরি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সুচারুভাবে প্রতিফলিত হয় এদিনের কর্মকাণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনের একজন সদস্যের কণ্ঠে পরিবেশিত কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে মুগ্ধতার আবেশে আপ্লুত হয়ে ওঠেন কার্যক্রমে উপস্থিত সকল সুধীজন। অতঃপর পাঠচক্রের তরুণ সদস্য সাত্ত্বিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'আমরা মায়ের দুর্জয় সেনা, নির্ভীক কোটি প্রাণ' সঙ্গীতটি ধ্বনিত হলে উপস্থিত সকলেই তাতে কণ্ঠ মেলান এবং সকলের সম্মিলিত কণ্ঠের অনুরণনে সমগ্র পরিবেশ এক অনন্য ভাবগাম্ভীর্য ও আবেগময়তায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিশেষে, পাঠচক্রের সদস্যরা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের হাতে প্রয়োজনীয় রন্ধন সামগ্রী তুলে দেন এবং এরই সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে এই মহতী উদ্যোগের। অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ক্ষেত্রে বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক বাসুদেব হালদারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সর্বোপরি, এদিনের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের নেপথ্যে ছিল অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও ভাবানুরাগী সুধীজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা।



LIVE THE UNCROWDED LIFE

JUST 30 PRESIDENTIAL HOMES

ahana is boutique living at its finest — a rare opportunity to own an exceptional esidence in a highly private, exclusive condominium.

KNOW MORE

, 4.5 & DUPLEX | 1 MIN FROM ACROPOLIS MALL | 5.03 CR* ONWARDS

WBRERA/P/KOL/2026/004104 | rera.wb.gov.in | LAND PARTNER nortex 98830 55000 primarcaahana.in PRIMARC AAHANA

রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলনী

রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৬ নভেম্বর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে শুভ বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র কার্যকারিণী সদস্য অজয় নন্দী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও নদীয়া জেলার সংগঠনের জেলা সভাপতি ও সম্পাদকগণ এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু সংগঠক ও সরকারি কর্মচারী।



মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে পাঁচ শতাধিক সরকারি কর্মচারীকে নিয়ে এত বড়ো একটি অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। কিন্তু আজ সেই সংশয় দূর হয়েছে। এই সাফল্যের প্রকৃত কৃতিত্ব শুধু কয়েকজন সংগঠকের নয়। ৫৪টি দপ্তরের প্রতিটি ইউনিটের সদস্য-সদস্যা এবং কলকাতা, হাওড়া, সল্টলেক, হুগলী, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার অসংখ্য কর্মচারী যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা সত্যিই অভূতপূর্ব। তাঁদের আর্থিক, সাংগঠনিক ও মানসিক সহযোগিতাই এই অনুষ্ঠানের মূল শক্তি। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমাপন

গত ৩ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার-স্থিত মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজে— কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও সংস্কৃতভারতী-র সহযোগিতায় আয়োজিত দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতী-র পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমিত মজুমদার, কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বর্গের ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে এই শিবির চলত। গত ২১ সেপ্টেম্বর এই শিবির শুরু হয়। শিবিরে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের জন্য প্রয়োজনীয় বার্তালাপ ও সম্ভাষণ শেখানো হয়। সম্ভাষণ শিবিরে প্রাণোচ্ছলভাবে সংস্কৃত শেখানোর জন্য শিক্ষক হিসাবে ছিলেন সংস্কৃতভারতী-র বিস্তারক ধনঞ্জয় দাস। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংস্কৃতে সুভাষিতম্, লঘু কথা, শিবিরের অনুভব কথন, একটি নাটিকা ও গীত পরিবেশন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমিত মজুমদার সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য ঐকান্তিকভাবে সকলের কাছে আবেদন রাখেন এবং পরবর্তীকালে কলেজেই সপ্তাহে একদিন সংস্কৃত সম্ভাষণ মিলন শুরু করার জন্য সকলের কাছে একটি প্রস্তাব রাখেন। সমাপনের শেষে কলেজের পক্ষ থেকে শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।



ঘাটালে বইমেলা ও চিকিৎসা শিবির

গত ১৫ অক্টোবর ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুলের উদ্যোগে বইমেলা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, তাঁর



সুযোগ্য পুত্র ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক ও ডাঃ শ্রীবাস সেন উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ প্রকাশ মল্লিক তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসা ব্যবস্থা নয়— এটা একে অপরের পরিপূরক। এছাড়াও তিনি হোমিওপ্যাথির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ডাক্তারবাবুরা পরে ৪২ জন রোগীকে বিনামূল্যে পরামর্শ করেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

ARICHA
since 1942
www.arichaindia.com

বহরমপুরে লঘু উদ্যোগ ভারতীর উদ্যোক্তা সচেতনতা ও বিশেষ ভেন্ডর উন্নয়ন কর্মসূচি



ন্যাশনাল এসসি-এসটি হাব এবং লঘু উদ্যোগ ভারতী, মুর্শিদাবাদের যৌথ উদ্যোগে নবগ্রাম বিডিও হলে 'উদ্যোক্তা সচেতনতা ও বিশেষ ভেন্ডর উন্নয়ন কর্মসূচি' সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০০ জন উদ্যোক্তা এবং নতুন উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী মানুষ অংশ নেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর এনএসআইসি লিমিটেড, কলকাতার জোনাল জেনারেল ম্যানেজার ড. অনুপম গায়েন অনলাইনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল এসসি-এসটি হাব প্রকল্পের উপর একটি ছোটো ছবি দেখানো হয়। তারপর এনএসএসএইচও-এর প্রধান বিজয় রুদ্র পাল হাবের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেন। এরপর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন : অনন্ত ঠাকুরাল, GeM প্রশিক্ষক-GeM-এ নাম নথিভুক্ত করা, ক্যাটালগ তৈরি এবং টেন্ডারে অংশ নেওয়ার পদ্ধতি। শ্রীমতী সাহেলী সরকার, ম্যানেজার, CWC মুর্শিদাবাদ ভেন্ডর হিসেবে নাম লেখানো এবং সরকারি ক্রয়ের সুযোগ। ড. ভি. বিজয়, বিজ্ঞানী-CCSRTI, বহরমপুর -সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের কেনাকাটার নিয়মকানুন। প্রদীপ গোস্বামী, ম্যানেজার, DIC, মুর্শিদাবাদ-এসসি-এসটি এমএস এমই-দের জন্য সরকারি সাহায্য। Integra-র প্রতিনিধি- ONDC কী এবং এমএস এমই-রা কীভাবে এর থেকে লাভ পাবে। লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, PNB, মুর্শিদাবাদ -এর আধিকারিক ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার সহজ উপায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে লঘু উদ্যোগ ভারতীর ন্যাশনাল কমিটি মেম্বার পল কুমার মিত্র বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় উদ্যোক্তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং সবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি খোলামেলা আলোচনা হয়। মাননীয় বিধায়ক দিলীপ সাহা তাঁর বক্তব্যে সমাজের মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় লঘু উদ্যোগ ভারতী যে কাজ করছে, তাতে তিনি খুব খুশি বলে জানান। অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘটনাস্থলে উদ্যম ও GeM রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শেষে লঘু উদ্যোগ ভারতী মুর্শিদাবাদের সভাপতি প্রহ্লাদ ঘোষ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসসি-এসটি উদ্যোক্তারা সরকারি প্রকল্প, সরকারি সাহায্য, ব্যাংক থেকে টাকা পাওয়ার উপায়, ভেণ্ডর রেজিস্ট্রেশন এবং সরকারি দপ্তরে মাল বিক্রি করার সুযোগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেন।



সংস্কৃত সঙ্গীত সঙ্ঘের পরিচালনায় সংস্কৃত আনন্দ অনুষ্ঠান

গত ৪ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনায় বেলঘরিয়া-স্থিত ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজে সংস্কৃত সঙ্গীত সঙ্ঘের পরিচালনায় সংস্কৃত আনন্দ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। বিগত ১০ বছর ধরে সংস্কৃত সঙ্গীত সঙ্ঘ সারা পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। সংস্কৃত ভাষার প্রসারে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে সংস্কৃত সঙ্গীত সঙ্ঘের সদস্যরা পুরোপুরি সংস্কৃত ভাষায় এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী প্রণব নন্দ, ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজের অধ্যক্ষ শুভ্রনীল সোম। 'কর্মযোগী'র পরিচালন সমিতি-র সভাপতি শান্তনু রুদ্র এদিনের অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন— ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে পুনরায় জাগরিত করার জন্য সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা হিসাবে না ভেবে 'মাতৃভাষা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা ভারতীয় পরম্পরাকে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংস্কৃত সঙ্গীত সঙ্ঘ যে কাজ করে চলেছে— ড. কল্যাণ চক্রবর্তী তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংস্কৃত ভাষায় এই অনুষ্ঠানটি দেখে আপ্লুত হয়েছেন প্রণব নন্দ। তিনি বলেন— তাঁদের প্রচেষ্টা এতদিন পর সাফল্যের মুখ দেখতে পাচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার পঠনপাঠনের মধ্য দিয়েই মানুষের চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্কৃত সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট সংস্কৃত সঙ্গীত শিল্পী তথা সংস্কৃত গীতিকার ও সুরকার অধ্যাপক ড. রুবেল পাল। মূলত তাঁর দীর্ঘ সাধনার ফল এদিনের এই অনুষ্ঠান। তার সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের স্বয়ংসেবক নারায়ণ মণ্ডল, ভজন কুমার পাল, ঋতব্রত গোস্বামী-সহ সন্ধ্যা হালদার, বিশিষ্ট অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত অনুরাগী গুণীজন ও ছাত্র-ছাত্রীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানে হয় সংস্কৃত গীতি আলেখ্য, গান, নৃত্য, বাদ্য, সংস্কৃত আবৃত্তি-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কলা ও কার্যক্রম। অন্তিমে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. রুবেল পালের সুললিত কণ্ঠে সংস্কৃত গানের মাধ্যমে সমগ্র সঙ্গীত সন্ধ্যার সভাকক্ষ আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

'দমদম রাষ্ট্রবাদী নাগরিক মঞ্চ'-এর উদ্যোগে শ্রীশ্রীগণেশ পূজা

গত ১৪ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীগণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে 'দমদম রাষ্ট্রবাদী নাগরিক মঞ্চ'-এর উদ্যোগে দমদম পূর্বসিঁথি, বকুলতলা মোড়ে গণেশ পূজা আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীগণেশ পূজার শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্রীয় নৈতিক শিক্ষা প্রমুখ চন্দ্রনাথ দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অমিতাভ রায়। সান্ধ্যকালে একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। এলাকার সুধী নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়া এলাকার সকল অধিবাসীর উদ্দেশ্যে আলুর দম সহযোগে খিচুড়ি ভোগ বিতরণের আয়োজন করা হয়। সান্ধ্যকালীন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোপাল চন্দ্র মিশ্র, দমদমের বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক প্রণব দত্ত, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সাংগঠনিক কলকাতা মহানগরের সহ-সভাপতি মৌমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সম্পর্ক প্রমুখ তরুণ রক্ষিত, সঙ্ঘের উত্তর-পূর্ব ভাগের বৌদ্ধিক প্রমুখ অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী টুম্পা কয়াল প্রমুখ বিশিষ্টজন। পূজা পরিচালনায় ছিলেন— আশিস গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, প্রদীপ ঘোষ, সুপ্রিয় ঘোষ, ড. শীর্ষেন্দু কর, সুব্রত মিশ্র, ডাঃ শিবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ বাগ, তরুণ ঘোষ, প্রদীপ দাস, প্রবীর সোম, অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস চন্দ, কৌশিক প্রধান ও শান্তি পাল। পূজার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন— রাজর্ষি মিত্র, রাজর্ষি কর, সোমনাথ চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায়, শুভ দেবনাথ, পলাশ হালদার, গৌতম মিদ্যা, বিকাশ সাহা, অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব ভট্টাচার্য, নিতাই আচার্য, অরুণ পাল, রত্নদীপ কুণ্ডু, সৌহার্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব কুমার সাহা, সুকান্ত সরকার, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কার্যকর্তা।



‘কাশী-বারাণসী : কালের একই তটে জীবনের আরতি ও অমৃতের আরাধনা’

ইতিহাসবিদেরা কাশীকে কেবল একটি প্রাচীন শহর হিসেবে নয়, বরং ভারতীয় নগরসভ্যতার এক ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রতীক হিসেব মূল্যায়ন করেন। এখানে অতীত নিছক স্মৃতিস্তম্ভে বন্দি নয়; বরং বর্তমানের সঙ্গে তার নিরন্তর সংলাপ চলছে।

ড. জয়দেব বিশ্বাস

দ্বিতীয় পর্ব

প্রাচীন কাশী : বৈদিক যুগের ঐতিহ্য, রাজবংশের উত্থান-পতন ও ইতিহাসের পথচলা—

কোনো জনপদের ইতিহাস কেবল তার প্রাচীনত্বে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেই জনপদ কত দীর্ঘকাল ধরে মানুষের জীবন, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে চলেছে, তার ওপরই নির্ভর করে তার প্রকৃত গুরুত্ব। কাশী সেই অর্থে এক অনন্য ঐতিহাসিক জনপদ। এখানে ইতিহাসের স্তরগুলি যেন একটির ওপর আর-একটি জমা হয়েছে। প্রতিটি যুগ কাশীকে নতুন কিছু দিয়েছে, আবার কাশীও প্রতিটি যুগকে সমৃদ্ধ করেছে।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে কাশীর উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক কাল থেকেই এই অঞ্চলের পরিচয় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও ঋগ্বেদে কাশীর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং উপনিষদে এই অঞ্চলের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এতে বোঝা যায়, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের বহু আগেই কাশী উত্তর ভারতের একটি সুপরিচিত জনপদে পরিণত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য কাশীর ইতিহাসকে

আরও সুস্পষ্ট করে। পালি ভাষার গ্রন্থসমূহে 'কাশী' একটি সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। সেই সময় কাশী শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল না; কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং হস্তশিল্পেও তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিশেষ করে কাশীর সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কারুশিল্প সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত সমাদৃত ছিল। অর্থাৎ ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও এই জনপদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে যে ষোলোটি মহাজনপদের কথা জানা যায়, কাশী ছিল তাদের অন্যতম। এটি ছিল এমন এক সময়, যখন নগরজীবন, বাণিজ্য, প্রশাসন এবং শিক্ষা নতুন রূপে বিকশিত হচ্ছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, কাশীর এই উত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অবস্থান, উর্বর ভূমি, জলপথে যোগাযোগ এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ— এই সব কারণেই কাশীর রাজনৈতিক ইতিহাস সব সময় শান্ত ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্য :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধের উত্থানের পূর্বপর্বে কাশী ছিল উত্তর ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মহাজনপদ। গঙ্গাতীরবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে কাশীকে কেন্দ্র করে কোশল, অঙ্গ ও মগধের মতো সমসাময়িক শক্তিগুলোর সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। বৌদ্ধ জাতককাহিনিতে কাশীর শক্তিশালী রাজাদের এবং তাদের সামরিক অভিযানের নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকী এক পর্যায়ে কাশীর রাজা কংস (কৃষ্ণের মামা নয়) কোশল জয় করেছিলেন বলে জাতক-পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য বদলে যায়। কোশলের রাজা মহাকোশল কাশীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাশী ক্রমশ কোশল রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মগধের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রও ধীরে ধীরে পূর্বদিকে সরে যায়। এইভাবে কাশীর প্রাচীন ইতিহাস শুধু একটি নগরীর ইতিহাস নয়; এটি উত্তর ভারতে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতন ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কখনো কোশল রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত, কখনো মগধের উত্থান— এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কাশীর রাজনৈতিক অবস্থান বদলেছে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হলো, শাসক পরিবর্তিত হলে কাশীর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত গুরুত্ব কখনো হ্রাস হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র অন্যত্র সরে গেলেও কাশী জ্ঞান, সাধনা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেই টিকে থেকেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও এই ইতিহাসকে সমর্থন করে। বর্তমান বারাণসীর নিকটবর্তী রাজঘাট অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত খননকার্যে বহু প্রাচীন বসতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, প্রাচীন ইটের নির্মাণ, মুদ্রা, অলঙ্কার এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা সামগ্রী থেকে গবেষকেরা মনে করেন, এই অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের বসবাস ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরগুলির ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে কাশীর ইতিহাস কোনো বিচ্ছিন্ন অধ্যায় নয়; এটি এক দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন নগরজীবনের সাক্ষ্য বহন করে।

ইতিহাসের আলোচনায় আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বহু প্রাচীন নগর আজ কেবল প্রত্নস্থল; সেখানে অতীতের স্মৃতি রয়েছে, কিন্তু সেই জীবনধারা আর নেই। কাশীর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অবিচ্ছিন্ন জনজীবন। প্রাচীন ঘাটের পাশে আজও মানুষের স্নান, উপাসনা, ব্যবসা, সঙ্গীতচর্চা ও দৈনন্দিন জীবন সমানভাবে চলমান। এই ধারাবাহিকতাই কাশীকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন জীবন্ত নগর হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

প্রাচীন কাশীকে বুঝতে গেলে আর একটি বিষয় মনে রাখতে হয়। এই নগর কখনো একমাত্র একটি ধর্ম বা একটি সম্প্রদায়ের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৈদিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি এখানে বিকশিত হয়েছে শ্রমণ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ দর্শন, জৈন ভাবনা এবং পরবর্তীকালে নানা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ধারা। মতের পার্থক্য থাকলেও জ্ঞানচর্চা ও সংলাপের পরিবেশ কাশীর অন্যতম শক্তি ছিল। ভারতীয় সভ্যতার যে উদার বৌদ্ধিক পরিসর, কাশী তার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাই বিখ্যাত ভারতীয় ঔপন্যাসিক জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী কথাসাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ ইতালির ভেনিস শহরের সঙ্গে বারাণসীর একটি অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'ভেনিস ও বারাণসীর মধ্যে যে একটি অদ্ভুত আত্মীয়তা রয়েছে তা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়, উভয় শহরই যেন সময়ের এক একটি প্রবেশদ্বার; তারা আপনাকে জীবনের হারিয়ে যাওয়া পথগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়।'

জ্ঞানের এই চিরন্তন অন্বেষায় লুকিয়ে আছে কাশীর অন্তহীন সম্পদ ও কালজয়ী প্রজ্ঞা। ইতিহাসের বিচারে কাশীর গুরুত্ব আরও একটি কারণে অসাধারণ। অধিকাংশ নগর কোনো একটি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু কাশীর পরিচয় তার চেয়েও বিস্তৃত। এটি এমন একটি জনপদ, যার খ্যাতি কোনো একক রাজবংশের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাসক এসেছেন, গেছেন; কিন্তু কাশীর পরিচয় টিকে রয়েছে তার জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, ধর্মীয় সহাবস্থান এবং মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে।

এই কারণেই ইতিহাসবিদরা কাশীকে কেবল একটি প্রাচীন শহর হিসেবে নয়, বরং ভারতীয় নগরসভ্যতার এক ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রতীক হিসেব মূল্যায়ন করেন। এখানে অতীত নিছক স্মৃতিস্তম্ভে বন্দি নয়; বরং বর্তমানের সঙ্গে তার নিরন্তর সংলাপ চলছে। এই সংলাপই কাশীকে আজও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে এবং ভারতের ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকায় পরিণত করেছে।

পরবর্তী পর্বে আমরা কাশীর ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করব— কেন এই নগরকে যুগে যুগে মুক্তির সাধনা, জ্ঞানসন্ধান এবং মানবিক সহাবস্থানের এক অসাধারণ কেন্দ্র হিসেবে দেখা হয়েছে, তার ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে।



নবান্ন শুধু উৎসব নয় : এক জীবনদর্শন

জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ

হেমন্তের হালকা শীতে বৈরাগীর সুরেলা প্রভাতি 'টহল' গানে ঘুম ভাঙে গ্রাম্য মানুষের। মাঠের আলপথে উদাসী বাউলের একতারার সুর, মেঘমুক্ত আকাশে উজ্জল সূর্যকিরণে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে সোনালি ধান ঝলমল করে। পাকা ধানের সুমিষ্ট গন্ধে বাতাস যখন আমোদিত হয়, তখনই সে জানান দেয়— নবান্ন এসেছে।

ছোট্ট একটি শব্দ 'নবান্ন'। নব অর্থে নতুন, অন্ন অর্থে ভাত। ছোটো হলেও এই শব্দটি চিরন্তন ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। এটি নতুন ধানের উৎসব, নতুন করে বেঁচে ওঠার উৎসব। এটি প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষের ঋণশোধের উৎসব, লক্ষ্মীদেবীর আবাহনের উৎসব। সর্বোপরি, সামাজিক মিলনের মহোৎসব, সাংস্কৃতিক নবজাগরণ, ঐতিহ্য ও পরম্পরার আদি উৎসব, যেখানে গ্রামের সহজ-সরল জীবনচর্যা পারিবারিক বৃত্ত ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ-প্রবাহের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

অরণ্যবাসী মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে অরণ্যের বীজ সংগ্রহ করে। প্রাচীন ভারতের সেই উত্তরসূরিরা আজও ভারতের অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে ও গ্রামের জঙ্গল-সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করেন, তাঁদেরই বলা হয় জনজাতি। কৃষিকাজ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ও অনিশ্চয়তায় ভরা। তাই তাঁদের পরিশ্রম যাতে ব্যর্থ না হয়, সেজন্য বহু আচার-বিধি মেনে চলতে হয়। জনজাতি গোষ্ঠীর প্রাচীন নিয়ম ছিল, নতুন ফসল নিজে গ্রহণ করার আগে তা প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ ও দেবতাকে উৎসর্গ করা। তাঁরা নতুন ধানের চাল থেকে হাঁড়িয়া, পিঠে ও গুঁড়ো তৈরি করে নাচ-গানের মাধ্যমে প্রকৃতি, তাঁদের দেবতা মারাং বুরু ও পূর্বপুরুষদের নিবেদন করে গ্রামের সকলে একসঙ্গে খেতেন।

সাঁওতালরা এই অনুষ্ঠানকে বলেন 'জম নাওয়া' অর্থাৎ নতুন খাওয়া। মুণ্ডা, হো, ভূমিজরা বলেন 'নাওয়া খাই' অর্থাৎ নতুন খাওয়া। লোধারা বলেন 'নবভক্ষণ' অর্থাৎ নতুন ভক্ষণ। লোকাচারের এই পবিত্র নিয়মপালনের উৎসব ছিল তাঁদের কাছে পরম আনন্দের এবং বেঁচে থাকার মূল চালিকাশক্তি। কারণ এর পরেই তাঁদের খাদ্যের অভাব মিটত। বেঁচে থাকার এই আনন্দই নবান্নের প্রাণ। কালক্রমে মানুষ জনজাতিদের কাছ থেকে কৃষিকাজ শিখল এবং কৃষিকে প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করল। গড়ে উঠল কৃষক সমাজ। ধানের শিষ দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা এবং ঢেঁকিতে নতুন চাল কোটার মাধ্যমে জনজাতিদের লৌকিক উৎসব 'নতুন খাওয়া' নবান্ন উৎসব নামে নতুন রূপ নিল। জনজাতিদের সেই লৌকিক উৎসবই কৃষক সমাজে 'নবান্ন' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে, মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাস পড়লেই গ্রামের

মোড়লরা চণ্ডীমণ্ডপে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে শুভ দিন-ক্ষণ দেখে নবান্নের দিন স্থির করেন। কয়েকদিন আগে থেকেই চরম ব্যস্ততা শুরু হয়। কৃষকরা খামার গোবরজলে নিকিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নতুন ধান এনে শুদ্ধাচারে ঝাড়াই করেন। গোবরজলে নিকানোর পিছনে রয়েছে এক সুপ্রাচীন বিজ্ঞান— গোবরে থাকা ফেনল, জৈব অ্যাসিড ও প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক উপাদান মেঝের ধুলো চেপে রাখে, ছত্রাক ও কীট-পতঙ্গকে দূরে রাখে এবং ধান ঝাড়াইয়ের জায়গাকে পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর করে তোলে। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে মেঝেকে শুকনো ও জীবাণুমুক্ত করার এই দেশজ পদ্ধতি আজও বিজ্ঞানসম্মত। গৃহের মেয়েরা সেই ধান রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে আতপ চাল তৈরি করেন। এই চালের গুঁড়োই নবান্নের প্রধান উপকরণ। বাড়ি ঘর, উঠোন, খামারবাড়ি গোবরজল দিয়ে ভালো করে নিকানোর পর আলপনা দিয়ে সাজানো হয়। এই আলপনা শুধু সজ্জা নয়, এটি গ্রামীণ সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের এক অপূর্ব প্রকাশ— হাতের আঙুলে চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা পদ্ম, ধানের শিষ, লক্ষ্মীর পা ও ময়ূরের নকশা। বিশ্বাস করা হয়, এই সাদা আলপনার পথ ধরেই ধনের দেবী লক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করেন, আর চালের গুঁড়োর এই আলপনা পিঁপড়ে-পোকামাকড়ের খাদ্য হয়ে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানায়।



নবান্নের দিন সকালে সকলে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করেন। মায়েরা শুদ্ধ বসনে গ্রাম্যদেবীর পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আসেন। এরপর শুরু হয় আসল আচার। ঘরের মধ্যে কলাপাতায় আতপ চাল, মিষ্টি ও ফল মিশ্রিত করে পূর্বপুরুষ, প্রকৃতি ও বসুমাতাকে উৎসর্গ করা হয়। প্রতি দরজার সামনে, উঠোনে, খামারবাড়িতে, দেবস্থানে এবং বাড়ির বাইরের বিভিন্ন দিকে কলাপাতায় পশুপাখির জন্য নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এই উৎসর্গের পরেই চালের গুঁড়োর সঙ্গে দুধ, মিষ্টি, কলা আদা, আখ, মুলোকুচি দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়, গ্রাম্য ভাষায় বলে 'চাল লবান'। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করে একসঙ্গে উঠোনের মিঠে রোদে বসে কলাপাতায় 'চাল লবান' পর্ব সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে আবার ঘরের মধ্যে কলাপাতায় পায়েস-সহ নতুন চালের ভাত নানান ব্যঞ্জন সাজিয়ে আবার পূর্বপুরুষ ও প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে সকলে ভোজন করেন। এটি শুধু খাওয়া নয়, এটি প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষের ঋণশোধ।

১. সামাজিক সমরসতা : নবান্নের দিন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে বাড়ি মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু ভেদ ভুলে সকলে এক উঠোনে, একসঙ্গে বসে কলাপাতায় খান। এই সমরসতাই নবান্নের প্রাণ। দু'দিনের রান্না একসঙ্গে হয়, পরের দিন রান্না হয় না, আগের দিনের রান্না করা খাবার সকলে খান— যাকে বলে 'পান্তা নবান্ন'।

মানুষ তাঁর উৎপন্ন ফসল নিজে গ্রহণ করার আগে সকল জীবকে খাদ্য বিতরণ করার পর গ্রহণ করেন।

২. সাংস্কৃতিক নবজাগরণ : নবান্নকে কেন্দ্র করে গ্রামে কবিগান, বাউল, যাত্রাগানের আসর বসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণের মতোই নবান্ন উৎসবের প্রচলন করে একে সার্বজনীন ও আধুনিক রূপ দেন। তাঁর দৃষ্টিতে নবান্ন হলো শ্রমের সার্থকতা ও মানুষের সামাজিক মিলনের মহোৎসব।

৩. বৈজ্ঞানিক দিক : নবান্নের আড়ালে রয়েছে এক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। নতুন ধানের চালের গুঁড়োর সঙ্গে দুধ, কলা, মিষ্টি, আলু, আদা, মুলো, আখ মিশিয়ে যে 'চাল লবান' তৈরি হয়, তা আসলে নতুন ফসলের পুষ্টিগুণ পরীক্ষার একটি দেশজ পদ্ধতি। এই মিশ্রণ সহজপাচ্য কিনা, শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, তা দেখে কৃষক নিশ্চিত হন ফসলটি নির্বিষ ও পুষ্টিকর। তবেই তিনি তা বাজারে বিক্রি করেন। গোবরজলে উঠোন নিকানো ও জীবাণুমুক্ত করাও এক প্রাচীন বিজ্ঞানসম্মত প্রথা।

সুতরাং নবান্ন কেবল একটি খাদ্যের উৎসব নয়। এটি একাধারে কৃতজ্ঞতাবোধ, সামাজিক সমরসতা, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং প্রাচীন লোক-বিজ্ঞানের এক অপূর্ব ও নান্দনিক সমন্বয়। যেখানে মানুষ প্রকৃতির কাছে মাথা নত করে তার ঋণ স্বীকার করে, পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে এবং জগতের সমস্ত জীবকে সঙ্গে নিয়ে নতুন অন্ন গ্রহণ করে— সেখানেই নবান্ন হয়ে ওঠে চিরন্তন বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব। □

জন্মদ্বিশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা রাজনারায়ণ বসু

ড. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু জাতীয়তা হলো ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক সামগ্রিক অভিপ্রকাশ। ভারতের জাতীয় পরিচয়কে হিন্দুসভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার একটি চিন্তাধারা। এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রাণপুরুষ রাজনারায়ণ বসু। বিশিষ্ট বাঙ্গালি চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসুর জন্ম দুশো বছর আগে ১৮২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে।

হিন্দু কলেজের রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র রাজনারায়ণ বসু রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবোধের দীক্ষা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন ‘‘জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।’’

রাজনারায়ণ বসু ছাত্রজীবন পাশ্চাত্য প্রভাবিত হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের যুক্তিবাদী চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে তাঁর মনে গভীর সংশয় ও মানসিক সংকট তৈরি হয়। ১৮৪৫ সালে পিতা ও ধর্মপত্নীর মৃত্যুর পর এই সংকট আরও তীব্র হয়। এই সংকটের সময় ধর্মবিশ্বাসের জন্য ১৮৪৬-এ তিনি ব্রাহ্মমত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মমতের একেশ্বরবাদ, উপনিষদের বৈদান্তিক চিন্তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মমতকে হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে করতেন না। ব্রাহ্মমত হিন্দুধর্মের সারাৎসার তথা পরম সত্যধর্ম একথা প্রতিপন্ন করার জন্য এই সময় তিনি রচনা করেন ‘ধর্মতত্ত্ব- দীপিকা’ গ্রন্থ।

এরপর তাঁর চিন্তায় জাতীয়তাবোধ ও হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের সংকল্প শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালে ‘জাতীয় গৌরব’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে হিন্দুমেলার সূচনা করেন। ১৮৭৩ সালে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। পরবর্তী জীবনে ১৮৮৭ সালে ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা’ প্রবন্ধে সমগ্র হিন্দুদের একত্রিত করে একটি মহা সংগঠন তৈরির রূপরেখা প্রস্তুত করেন।

বলে নেওয়া ভালো, উনিশ শতকে ভারতে ইসলামি আধিপত্য এবং ইসলামি সংগঠন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ওয়াহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে মজহবি সংস্কার শিক্ষার সংস্কার থেকে ইসলমি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি, ধীরে ধীরে দ্বিজাতিতত্ত্ব, পাকিস্তানের দাবি, ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুদের সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা



> “রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন—‘‘এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমুখর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার নবীন পবিত্রতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।’’”

নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন—‘‘হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তাহলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।’’ ‘‘মুসলমানরা নিজেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে

পারে, আর তারা তা করেছে এবং এখনো করছে। আমরা তো কখনো বাধা দিতে দাঁড়াইনি। আমরা যখন দিয়েছি তখন তারাই-বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না। আমরা সংঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫খ খণ্ড)।

১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু 'Socity for the promotion of national feling among the Educated Natives of Bengal' (স্বজাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ-সঞ্চারিণী সভা) নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন। এই পুস্তক পাঠ করে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দুমেলার সূচনা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন—''আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।" কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই মেলায় তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন।

১৮৬৭ সাল থেকে হিন্দুমেলা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় পার্সির বাগানে (মানিকতলা) আর ১৮৭৬-৭৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে (টালার বাগান)।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হয়েছে হিন্দুমেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। বাবু চন্দ্রশেখর বসু হিন্দুধর্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। মেলার দ্বিতীয় দিবসে ১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে ন্যাশনাল স্কুল, নর্মাল স্কুল এবং চাঁপাতলা স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে সভায় বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

মেলায় নানাপ্রকার প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য এবং অগ্নি ক্রীড়া হয়েছিল। পতাকা, আশা (রাজদণ্ড), সোটা (রুপা বাঁধানো লাঠি, গদা) নিয়ে জাতীয় কীর্তন গাইতে গাইতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বারবার মেলাস্থলে গমন করেন। এসব দর্শনার্থে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা পত্র ও পুষ্পাদিতে পরম রমনীয় রূপে শোভিত হয়েছিল। দ্বারদেশে কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হয়েছিল। মেলাস্থলে নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়েছিল। একজন বাঙ্গলির সঙ্গে একজন পাঞ্জাবি পালোয়ানের কুস্তি হয়েছিল। যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্যের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হলেন। বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের সঙ্গীতনৈপুণ্যে সকলে মুগ্ধ হন।

মেলাস্থলে নানাবিধ স্বদেশী সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। কৃষি বিভাগে নানাবিধ ফল, মূল, পুষ্প ও বৃক্ষ আনা হয়েছিল। সূচিকার্য, কারুকার্য এবং নানাস্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছিল। বিখ্যাত বিদূষী রমাবাঈ ভারতীয় ভাষাশিক্ষার আবশ্যকতা, হিন্দু ললনাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা এবং পুরাকালের আর্য নারীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করে দর্শকদের বিমোহিত করেন। রজনীতে অগ্নি-ক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়।

হিন্দুমেলার চতুর্থ অধিবেশনের পর নবগোপাল মিত্র National Society অর্থাৎ 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়ভাব সঞ্চারিত করা। প্রতি মাসে এর একটি করে অধিবেশন এবং ওই সম্বন্ধে বক্তৃতা হতো। এরই এক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতার সারাংশ পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথমে 'ন্যাশনাল পেপার' এ 'Lecture on the superiority of Hinduism to other prevailing religious' নামে প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা প্রমাণ করতে তিনি ১২টি যুক্ত প্রদান করেন।

প্রথমত, কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে হিন্দুধর্মের নামকরণ হয় নাই। বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয়, মহম্মদীয় মত, বুদ্ধ, খ্রিস্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত। হিন্দুধর্ম তেমন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রচলিত নয়। এর দ্বারা হিন্দুধর্মের প্রশস্ততা প্রমাণ হয়। ধর্ম সনাতন পদার্থ। তা কোনো ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দুধর্মে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার অবতারের কথা কথিত আছে। কিন্তু এমন বলে না যে অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম কোনো মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। উপনিষদে ব্রহ্মা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।
নায়াং কুতশ্চিম নবভূব কশ্চিৎ।।

তৃতীয়ত, হিন্দুধর্ম ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোনো মধ্যস্থ পয়গম্বর স্বীকার করে না। খ্রিস্টানরা প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে বলে 'Through Jesus christ our Lord and Saviour' 'প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ করো'—হিন্দুরা এরকম বলে না। খ্রিস্টান মুসলমানরা মনে করে একজন বিশেষ ব্যক্তি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। এইরকম ব্যক্তিকে পয়গম্বর বলে। কিন্তু আমাদের ঋষিগণ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। মুক্তিলাভের জন্য কোনো পয়গম্বরের উপাসনার আবশ্যকতা নেই।

চতুর্থত, হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জেনে উপাসনা করার উপদেশ আছে। কোরান, বাইবেল বা অন্য কোনো গ্রন্থে এরকম উপদেশ পাওয়া যায় না।

পঞ্চমত, হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের উপদেশ আছে। সংসারে থেকে

জীবনের সর্বক্ষেত্রে কী বিষয়কর্মে, কী আনন্দে কী সামাজিক আলাপ-আলাপনের সময়ও ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। তাহলে মুহূর্তের জন্যও ব্রহ্মর সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয় না।

ষষ্ঠত, হিন্দুধর্মে সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকার উপাসনার বিধি আছে; কিন্তু অন্য ধর্মে নিষ্কাম উপাসনার কথা নেই। অন্যান্য ধর্মে উপাসনা পুরস্কার-সাপেক্ষ। কিন্তু হিন্দুগণ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ধর্মচর্চা করেন পুরস্কারের অপেক্ষা না করে ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মচর্চাই এই উপাসনার প্রথম ও শেষ কথা।

সপ্তমত, হিন্দুধর্মে সর্বভূতের প্রতি দয়া করার উপদেশ আছে। বাইবেল কোরান কেবল মানুষের প্রতি দয়া করার উপদেশ দেয়। হিন্দু ধর্মে পশুপাখি জীব সর্বভূতের কল্যাণ কামনা করা হয়। 'মা হিংসাৎ সর্বভূতানি সর্বভূত হিতেরতঃ' একথা প্রমাণ করে।

অষ্টমত, অন্যান্য মতে অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করবে আর পাপী ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে পতিত থাকবে। কিন্তু হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হলে, সে উন্নতির পথে যাত্রা করে, এক লোক থেকে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করতে করতে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে উপনীত হবে। এই মত ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

নবমত, হিন্দুধর্মের ঔদার্য সর্বাপেক্ষা অধিক। খ্রিস্টান ও মুসলমান মত বলে, আমার মত না মানলে, তুমি অনন্ত নরকে পতিত হবে। হিন্দুধর্ম বলে, যার যে ধর্ম, সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্বপ্রকারে পালন করলেই উদ্ধার লাভ করবে। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টমত এর সম্পূর্ণ বিপরিত। মুসলমান বলে, পৌত্তলিক দেখ আর কাট। খ্রিস্টানরা বলে হিন্দুরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ঈশ্বরের পূজা করে না—শয়তানের পূজা করে।

দশমত, হিন্দুধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিধান আছে। প্রাতঃকাল থেকে সায়ংকাল এবং সায়ংকাল থেকে প্রাতঃকাল পর্যন্ত প্রতিটি কার্য ঈশ্বরের পূজা-স্বরূপ।

একাদশত, হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্মা ও সমাজ কাউকে অবজ্ঞা করে না। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং' শরীর সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকলে তা ধর্মসাধনার অনুকূল হয়। হিন্দুধর্মে স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানস্বাস্থ্যের সঙ্গে ধর্মের যোগস্থাপন করা হয়েছে। রাজনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি, গার্হস্থ্য নীতি, সবকিছুই ধর্মের অঙ্গ। ব্যাকরণ জ্যোতির্বিদ্যাও ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অন্য সভ্যতায় সাত্ত্বিক ও বৈষয়িক দুই প্রকার শাস্ত্রবিভাগ আছে। হিন্দুদের মধ্যে সেরকম নেই। হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ কাউকে অবজ্ঞা না করায় ভারতবর্ষে ধর্মসভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল। ভবিষ্যতে এই সভ্যতা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হবে। তখন পৃথিবী এক নতুন শ্রী লাভ করবে।

দ্বাদশত, হিন্দুধর্ম সকল জ্ঞানের আদি উৎস। অন্য ধর্মা অপেক্ষা হিন্দুধর্ম প্রাচীন। মানুষের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্বে এই ধর্মের উৎপত্তি। হিন্দুধর্ম খ্রিস্টমত অপেক্ষা প্রাচীন। বৌদ্ধধর্ম এর বিদ্রোহী সন্তান। আর মহম্মদীয় ধর্ম তো, এই সেদিনের। এর দ্বারা প্রতীত হয় যে এই হিন্দুধর্মে এমন কোন দর্শন আছে, যা মানুষের হৃদয়কে অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত অধিকার করে রাখতে পারে।

বাইবেল কোরানে আছে, ঈশ্বর জগতের বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমান, কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির বেদের প্রয়োজন হয় না। আবার বশিষ্ঠ বলেছেন—'ব্রহ্মা যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তাহলে তা তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করবে।

এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো রিলিজিয়ান বা মজহবে পাওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি এই ধর্ম অবলম্বন করবেন, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকার নিরত, নির্বিকার, সদাশয়, মাৎসর্যবিহীন, দম্ভহীন, বিশুদ্ধচিত্ত, পিতামাতার সেবায় তৎপর, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞানকারী, ব্রহ্মান্বেষণে সদা নিযুক্ত, তিনি সকল কর্মের আরম্ভে 'তৎসৎ' বলবেন, এবং সকল কর্মের শেষে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলবেন। এটাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সনাতন ধর্ম।

এই গ্রন্থের শেষে লেখক আশা করেছেন, হিন্দুধর্ম আবার সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হবে। মিল্টন তাঁর স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলেছেন— "Methinks I see in my mind a noble and pusssant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invineible locks; Methinks I see her as an eagle mening her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam."

"আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি—আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

এরপর ১৮৮৭ সালে ভারতের সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি মহাহিন্দু সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব রচনা করেন রাজনারায়ণ বসু। এই প্রস্তাবের শিরোনাম 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা।' এখানে তিনি বলেছেন, মুসলমানদের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগের যেমন Anglo-India Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গিদের Eurasian and Anglo Indian Association নামক জাতীয় সভা আছে—সেইরূপ হিন্দুদের একটি জাতীয় সভা স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুদের ধর্ম রক্ষা, অধিকার রক্ষা, হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপন এবং হিন্দুদের উন্নতি সাধন, এই সভার উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উল্লেখ করেছেন—গভর্নমেন্ট পুরীর রাজার হাত থেকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের বংশ পরম্পরাগত কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন।

হিন্দুদের একটি সংগঠন থাকলে, গভর্নমেন্টের কাছে এর প্রতিবাদ করা যেত (বলা বাহুল্য এই পুস্তক প্রকাশের পর গভর্নমেন্ট এই কার্য প্রত্যাহার করে)।

হিন্দু সংগঠন সংস্কৃত ভাষা চর্চায় যত্নবান হবে। যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করবে। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে যুবকদের নৈতিক উন্নতিসাধন করবে। যাতে তারা ইউরোপীয় স্বার্থপর ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারী না হয়। মদ্যপান নিবারণে সচেষ্ট হবে। দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর করতে সচেষ্ট হবে। স্বদেশী শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেবে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে হিন্দু জাতিকে অগ্রণী করে তুলবে।

হিন্দুগণ ধর্মপরায়ণ জাতি। তাই হিন্দুসমিতি ধর্মমূলক হবে। এই গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু ৩০টি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেছেন।

১। সমস্ত হিন্দু এই সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

২। হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য।

৩। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুর ঐক্য এই সমিতির লক্ষ্য। হিন্দু জাতির উন্নতির জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হলেও মুসলমানদের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান কর্তব্য।

৪। মহা হিন্দুসমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকবে। এখানে 'ঈশ্বর এবং মাতৃভূমি'—এই বাক্য অঙ্কিত থাকবে। এই বাক্যের নিম্নে একটি পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি থাকবে এবং তার নিম্নে 'সনাতন ধর্মের জয়' এই বাক্যটি অঙ্কিত থাকবে। মহা হিন্দু সমিতির প্রত্যেক সভ্য উক্ত সাংকেতিক চিহ্ন এবং মহাবাক্য নিজ নিজ অঙ্গুরীয়ের উপর অঙ্কিত করে ধারণ করবেন।

৫। হিন্দুদের মতে সকল বিষয়েরই ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। মহাহিন্দু সমিতির অধিবেশনে হিন্দু সমাজের সকল প্রকার উন্নতি অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্ম, শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করা হবে। ভারতবর্ষের পূর্ব মহিমার স্মৃতি রোমন্থন এবং দেশের বর্তমান অনুন্নত অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে সদস্যদের মনে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা হবে। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতির মধ্যে ঐক্য এবং সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস করা হবে।

৬। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে মহাহিন্দু সমিতির শাখা সংস্থাপিত হবে। এই সমস্ত শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু সমিতি বলে গণ্য হবে।

৭। প্রত্যেক শাখায় একজন সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকবেন।

৮। যে ঘরে শাখা-সভার অধিবেশন হবে, তার দ্বারে নারকেল ফল আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ সংস্থাপিত হবে। যে গালিচার উপর অধিবেশন বসবে, তার মধ্যস্থলে পুষ্প-পূর্ণ পুষ্পপাত্র শোভার্থে রাখা হবে। পূর্বে উল্লিখিত ভারতীয় চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ পদ্ম পুষ্পের প্রতিকৃতি ও 'ঈশ্বর ও মাতৃভূমি' এই বাক্য অঙ্কিত ধ্বজা প্রতি অধিবেশনে সভাগৃহের উপরে সংস্থাপিত হবে। সভার কার্য আরম্ভের পূর্বে ধুনা পোড়ানো হবে ও ধূপ দ্বীপ জ্বালানো হবে এবং শঙ্খধ্বনি করা হবে। দিবসে অধিবেশন হলেও দীপ জ্বালা হবে।

৯। সম্পাদক, উপস্থিত সকল সভ্য আসন গ্রহণ করার পর সকলের কপালে চন্দনচিহ্ন ও গলায় মালা দিয়ে সমিতির কাজ আরম্ভ হবে। তারপর সভাপতি সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের উপযোগী, ভগবদ্‌গীতার ১২টি শ্লোক স্তব দণ্ডায়মান হয়ে পাঠ করবেন।

একাদশ অধ্যায় ঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ

এরপর সকলে ঈশ্বরকে প্রণাম করবেন। তারপর সভাপতি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদ পাঠ করবেন।

''একত্রে গমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের মন এক বলিয়া জান, তোমাদের মন এক হোক। তোমাদের হৃদয় এক হোক। তোমাদের চেষ্টা এক হোক। তাহলে মঙ্গল তোমাদের অনুগামী হবে।"

এরপর সভাপতি ও উপস্থিত সভ্যগণ সমস্বরে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই শ্লোকটি তিনবার পাঠ করবেন। পরে কোনো সভ্য আর্যনামাবলী পাঠ করবেন। আর্যনামাবলীতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত আর্যদের নাম উল্লেখিত।

আর্য নামাবলী

রাজা

১। মান্ধাতা ২। পুরুরবা ৩। সগর ৪। দিলীপ ৫। ভগীরথ ৬। অজ ৭। দশরথ ৮। পরশুরাম ৯। শ্রীরামচন্দ্র ১০। লব ১১। কুশ ১২। জরাসন্ধ ১৩। দুর্যোধন ১৪। যুধিষ্ঠির ১৫। নন্দ ১৬। মহানন্দ ১৭। চন্দ্রগুপ্ত ১৮। হরিশ্চন্দ্র ১৯। তেজশেখর ২০। বিক্রমাদিত্য ২১। দেবপাল।

বীর

১। রাম ২। লক্ষ্মণ ৩। শ্রীকৃষ্ণ ৪। ভীম ৫। অর্জুন ৬। ভীষ্ম ৭। কর্ণ ৮। দ্রোণ ৯। কৃপ ১০। বিজয় সিংহ ১১। পুরু ১২। ললিতাদিত্য (কাশ্মীর) ১৩। পৃথুরায় ১৪। রাণাপ্রতাপ ১৫। শিবাজী ১৬। যশোবন্তরাও হোলকর ১৭। রঞ্জিত সিংহ।

বীরাঙ্গনা

১। সীতা ২। সাবিত্রী ৩। দময়ন্তী ৪। দুর্গাবতী ৫। পদ্মাবতী ৬। কর্মদেবী ৭। কর্ণাবতী ৮। কমলাবতী

কবি

১। বাল্মীকি ২। ব্যাস ৩। কলিদাস ৪। ভবভূতি। ৫। মাঘ। ৬। শ্রীহর্ষ। ৭। জয়দেব

দর্শনিক

১। ব্যাস। ২। বৈশিষ্ট। ৩। গৌতম। ৪। জৈমিনী। ৫। কপিল ৬। পতঞ্জলি ৭। কণাদ ৮। শঙ্করাচার্য ৯। মাধবাচার্য।

পুরাবৃত্ত লেখক

১। রাজতরঙ্গিনীর লেখকগণ

জ্যোতির্ব্বেত্তা

১। বরাহমিহির ২। ভাস্করাচার্য ৩। আর্যভট্ট

আর্যনামাবলী পাঠের পর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গাওয়া হবে। তারপর অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হবে।

ক। হিন্দুজাতির উন্নতিসাধক কোনো কার্যসম্বন্ধে পরামর্শ প্রস্তাব পাঠ।

খ। হিন্দুজাতির মঙ্গলজনক কোনো লিখিত প্রস্তাব পাঠ।

গ। সভ্যগণের দ্বারা উক্ত প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা।

ঘ। দেশাত্মবোধক বক্তৃতা।

যদি হিন্দুদের মঙ্গলজনক কোনো কার্যের পরিকল্পনা থাকে তাহলে প্রস্তাব পাঠ ও বক্তৃতা না হয়ে শুধু কার্য বিষয়ক আলোচনা হবে। এরপর বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে।

৯। স্বদেশ-প্রেমিকা হিন্দু সীমন্তিনীগণ যে ঘরে সমিতির অধিবেশন হবে, তার অব্যবহিত নিকটবর্তী অন্য ঘরে বসবেন। দুই ঘরের মধ্যে একটি পর্দা ফেলা থাকবে। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত সেখানে পর্দার আবশ্যক নেই।

১০। যে স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে যে ভাষা প্রচলিত, সেই ভাষায় সমিতির কার্য সম্পাদিত হবে।

১১। মহাহিন্দু সমিতির সভ্যগণ সর্বভারতীয় সদস্যগণের সঙ্গে হিন্দি ভাষা এবং দেবনাগরী অক্ষর অবলম্বন করে পরস্পর পত্র বিনিময়, আলাপ আলোচনা করবেন। এরূপ আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে বিদেশি ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেওয়া স্বদেশপ্রেমী হিন্দুদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

১২। গ্রামে নগরে যেখানে শাখা সমিতি স্থাপিত হবে সেখানে মধ্যে মধ্যে নগর-সংকীর্তন হবে। 'ঈশ্বর ও মাতৃভূমি', 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক বাক্য অঙ্কিত ধ্বজা সকলের হস্তে থাকবে। নগর সংকীর্তনে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে।

১৩। মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষের হিন্দুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে উন্নতি সাধনে যত্নবান হবে। শিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, নগর ও গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্য বিধান, বিবাহের ব্যয় ইত্যাদি সামাজিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক সমস্যা যথা বিধবা-বিবাহ, বাল্য বিবাহ, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি আলোচিত হবে না।

১৪। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ব্রাহ্ম—যে কোনো মতাবলম্বী ব্যক্তি, যিনি নিজেকে হিন্দুধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেবেন তিনিই সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

১৫। মহাহিন্দু সমিতি যুবকদের জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন করবে। হিন্দু যুবকদের শরীরচর্চা এবং পৌরুষসূচক ক্রীড়া অভ্যাস করার উৎসাহ প্রদান করবে। অস্ত্র আইন প্রযুক্ত হওয়ায় অস্ত্রের ব্যবহারের অভাবে হিন্দুগণ ক্রমশ দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়ছে। মহাহিন্দু সমিতি অস্ত্র আইন রদ করার জন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন করবে।

১৬। মহাহিন্দু সমিতি স্বদেশী শিল্পে উৎসাহ প্রদান করবে। যে জেলায় যে বিশেষ শিল্প অথবা বাণিজ্য বিখ্যাত ছিল ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেই শিল্প অথবা বাণিজ্যকে উৎসাহ দেবে, কোথাও দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য স্থাপন করবে।

১৭। মহাহিন্দু সমিতি কৃষির উন্নতির জন্য এবং গো-জাতির সংরক্ষণের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করবে। গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন হিন্দুজাতির ঐক্যসাধনের একটি উপায় বা মাধ্যম। মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে গোহত্যা নিবারণের জন্য বৈধ আন্দোলন ও চেষ্টা করবে।

১৮। মহাহিন্দু সমিতির মফস্সলবাসী সদস্যগণ গ্রামের দরিদ্র হিন্দুদের নীতিশিক্ষা, কৃষিবিদ্যাশিক্ষার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন করবে। মাঝেমধ্যে তাদের প্রাচীন হিন্দুদের মহিমা এবং ধার্মিকতা বিষয়ে এবং তাদের বর্তমান দুরবস্থা মোচনের জন্য, তাদের উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সম্পাদনের জন্য বক্তৃতা করবে।

১৯। মহাহিন্দু সমিতি নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে। সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণে সমিতি যত্নবান হবে।

২০। মহাহিন্দু সমিতি ইংরেজি ভাষার বিদ্যালয়ে হিন্দু শাস্ত্র থেকে সংকলিত নীতিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবে।

২১। মহাহিন্দু সমিতির অধীনে বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়ে এমন সকল পুস্তক পড়ানো হবে, যাতে মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

২২। মহাহিন্দু সমিতি নতুন পুষ্করিণী খনন অথবা পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করবে।

২৩। মহাহিন্দু সমিতির সভ্যরা দরিদ্র সভ্যদের সাধ্যমত অর্থানুকূল্য করবে এবং দারিদ্রের দুঃখমোচনে যত্নবান হবে।

২৪। মহাহিন্দু সমিতি বিদ্যালয় উত্তীর্ণ অতি দরিদ্র হিন্দু ছাত্রদের টাকা ঋণ দিয়ে ব্যবসায় প্রবৃত্ত করাবেন। তাদের সচ্চরিত্রের প্রমাণপত্র দিতে হবে। ব্যবসায় সফল হলে তারা সুদ-সহ ঋণ পরিশোধ করবেন।

২৫। মহাহিন্দু সমিতির বক্তা, গায়ক এবং কথকগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে গমন করে আর্যকীর্তি কীর্তন করে লোকের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করবেন। তাঁরা নানা স্থানে মহাহিন্দু সমিতির শাখা স্থাপন এবং সমিতির অন্যান্য কার্যসাধনে যত্নবান হবেন।

২৬। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গ্রামে মহাহিন্দুসমিতির শাখা সংস্থাপিত হবে। এইসব শাখা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। গ্রামস্থ সমিতিগুলি নাগরিক সমিতির এবং নাগরিক সমিতিসকল মহানাগরিক সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করবেন। মহানাগরিক শাখাসমিতিগুলি নিম্নলিখিত নামে খ্যাত হবে ঃ

১। কলিকাতা শাখাসমিতি
২। বোম্বাই শাখাসমিতি
৩। লাহোর শাখাসমিতি
৪। প্রয়াগ শাখাসমিতি
৫। মাদ্রাজ শাখাসমিতি

সকল গ্রাম্য, নাগরিক এবং মহানাগরিক শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু সমিতি নামে খ্যাত হবে।

২৭। প্রতি বছর বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, হরিদ্বার এইরকম কোনো তীর্থস্থানে মহানাগরিক, নাগরিক ও গ্রাম্য শাখা-সমিতি থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে। ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহাসভায় হিন্দুসমিতি প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। সেখানে প্রতিনিধিগণ মুসলমান প্রতিনিধিগণের সঙ্গে একত্র কাজ করবেন।

২৮। যে তীর্থস্থানে মহাহিন্দু সমিতির বাৎসরিক মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে সেই স্থানের এবং সেই প্রদেশের সদস্যগণ আগন্তুক অতিথি সৎকার কার্য সম্পাদন করবেন। তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত অভ্যর্থনা

কমিটি ভারতবর্ষের সকল স্থানের শাখাসভ্যকে উক্ত মহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাতে নিমন্ত্রণ করবেন। বাৎসরিক সভাদ্বারে জলপূর্ণ কলস স্থাপন, ধূপধুনা পোড়ানো, ভগবদ্‌গীতা পাঠ জাতীয় সংগীত গীত হবে।

২৯। যে স্থানে বাৎসরিক মহাসভা হবে সেই স্থানে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে।

৩০। মহাসভার কাজ হিন্দি ভাষায় সম্পাদিত হবে। প্রত্যেক সভ্যকে মহাহিন্দু সমিতি প্রবেশের দক্ষিণাস্বরূপ এক টাকা এবং প্রতিবৎসর দাতব্য অন্যূন এক টাকা দিতে হবে।

এই তাত্ত্বিক রূপরেখা তথা বৌদ্ধিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর কয়েকমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের 'একটি গীত' প্রবন্ধে লিখেছেন—''কোথায় আমার সেই বঙ্গলক্ষ্মী যিনি প্রাচীনকালে এই সোনার বাঙ্গালা আলো করিয়া বসিয়াছিলেন? তাঁহার কি আবার দেখা পাইব না? রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, যে বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব আবার জাগিবে। রাজনারায়ণের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

ধর্মীয় প্রতীকের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ প্রচারের যে রূপরেখা রাজনারায়ণ বসু তৈরি করেন, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ গ্রন্থে তাকে দার্শনিক ও সাহিত্যিক রূপ দান করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—''বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমকে ধর্মে ও ধর্মকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছিলেন। রাজনারায়ণের জাতীয়তাবাদী ভাবনায় দেশের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের যে আকলুতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তাকেই দেশমাতৃকা বা ভারতমাতার রূপকে ফুটিয়ে তোলেন।''

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন— ''রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সহিত বাজিতে থাকুক।''

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭২ সালে কলকাতা সফরের সময় রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। ঐতিহাসিক জে.টি.এফ জর্ডেন্স তাঁর ''Dayananda Saraswati–His life and India'' গ্রন্থে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' স্বামী দয়ানন্দকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। এবং একটি অনুলিপি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক পুনর্জাগরণের মাধ্যমে বাস্তবে সুসংগঠিত আর্যসমাজ গঠন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং প্রবীণ ঋষিতুল্য এই ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দেওঘরে মাতামহের কাছে তিনি বহুবার এসেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যুতে শ্রী অরবিন্দ ল্যাটিন ভাষায় একটি সনেটে লিখেছিলেন—'Transiit non Periit' (ত্রানসিইত নন পেরিইত)—মহাপ্রয়াণ মানে সম্পূর্ণ ধ্বংস নয়, বরং তা পবিত্র নদীর মহাসমুদ্রে মিশে যাওয়ার মতো পরম চেতনার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তিরোধানের পরও তাঁর চেতনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম শক্তির সঙ্গে মিশে দেশ ও জাতির অন্তরে অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

সত্যসত্যই রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু জাতীয়তাবোধ পরবর্তীতে লালা লাজপত রায়, মহামান্য তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের হাত ধরে চরমপন্থী গণমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সাভারকার হিন্দুত্বকে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক জাতীয়তার মতবাদ হিসাবে বিকশিত করেন। ডাঃ হেডগেওয়ার, শ্রীগুরুজী হিন্দুত্বভিত্তিক সমাজ সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দ্বারা তাকে আরও বিকশিত করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন—''এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমুখর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার নবীন পবিত্রতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।''

জন্মদ্বিশতবর্ষে এই মহান মনীষীকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। □

With Best Compliments Form -

A

Well Wisher

বিকশিত ভারতের স্বার্থে দেশের যুবসমাজকে টেনে তুলতেই হবে

অজয় ভট্টাচার্য

ভারত একটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। যার ফলে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বছর বছর বাড়ছে। শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন রাস্তা, রেল, বিমানবন্দর, বন্দর ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। প্রযুক্তি, উৎপাদন ও ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার ঘটছে। মানুষের গড় আয় ও ভোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সমাজের প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে এই উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি যদি কর্মসংস্থান, আয়বৈষম্য, মূল্যবৃদ্ধি বা দারিদ্র্যের মতো সমস্যাগুলি থেকে যায়, তাহলে সেই প্রবৃদ্ধির সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছয় না। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির বৈপরীত্য হলো, এটি যতটা মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ক্ষমতা রাখে, তার চেয়েও বেশি নতুন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ অর্থনীতি যত এগোয়, মানুষের চাহিদা, প্রত্যাশা ও জীবনমানের আকাঙ্ক্ষাও তত বাড়ে। কিন্তু অনুযায়ী প্রত্যাশা পূরণ হয় না। ফলে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের তরুণ জনসংখ্যার আকার মানব ইতিহাসে এযাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ। বিশেষ করে ১৫ থেকে ২৯ বছর বা ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সি মানুষের সংখ্যা বিবেচনা করলে, বর্তমানে ভারতের তরুণ জনগোষ্ঠী বিশের যেকোনো দেশের অতীত বা বর্তমানের তুলনায় সর্ববৃহৎ। গোটা বিশ্বে জন্মহার কমতে থাকায়, এটি আর কখনোই অন্য কোনো দেশের সঙ্গে মিলবে না বা কেউ এটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। ভারতের ৩০ বছরের কম বয়সি মানুষের সংখ্যা ৭৫.৩ কোটি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের সংখ্যা ৩৭.১ কোটি। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত প্রসারমান অবকাঠামো এবং এই বিপুল যুবশক্তির সমন্বয় আগামী দশকগুলিতে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে পরিণত করতে পারতো, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি প্রধান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে পরিণত করতে পারতো, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির বৈপরীত্যের কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

কৃষি উৎপাদন থেকে আয় কমে গেছে, যা তরুণদের গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। শহরগুলোকে কেন্দ্র করে এমন একটি সেবা-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে আমরা ক্রমশ ধাবিত হচ্ছি, যে অর্থনীতিতে সুযোগগুলো কেবলমাত্র শহরেই সৃষ্টি হয়। ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্তীকরণ বা ভর্তির হার ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ কোটিতে পৌঁছেছে, যা একটি সর্বভারতীয় নগর অর্থনীতির দিকে আরও বেশি সংখ্যক যুবসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এই অর্থনীতি তাদের কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারছে না।

প্রতি বছর এক কোটি ২০ লক্ষ ভারতীয় তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে। অপরপক্ষে সরকার পরিচালিত কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে চলেছে। যেখানে সরকার পরিচালিত কর্মসংস্থানই নবীন প্রজন্মের মূল ভরসার জায়গা। ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাত স্থবির হয়ে পড়েছে। এক দশকের ধারাবাহিক ধাক্কা সামলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ভারতে মাত্র ৩.৭৩ শতাংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে। যেখানে জার্মানিতে ৭৫ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে ৯৬ শতাংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে।

যে সকল শিল্পগুলো নিয়োগের প্রধান ভরসা তারা মাত্র ৪২.৬ শতাংশ স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েটকে নিয়োগযোগ্য বলে গণ্য করছে। এর ফলে কেবল বেকারত্ব তৈরি হচ্ছে এমনটা নয়, এমন একটি হতাশ যুবসমাজের স্থায়ী দল তৈরি হচ্ছে, যারা স্বাবলম্বী হয়ে সমৃদ্ধি অর্জনের কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না। তাই ভারতকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে পরিণত করতে হলে দেশের এই বিশাল যুবশক্তিকে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এই সম্ভাবনাময় তরুণদের দক্ষতা, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের আলোয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষান্তে তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিল্প ও পরিষেবা খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্মর্তব্য যে, দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে, স্থিতিশীলতার স্বার্থে, পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক পরিসরে ভারতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকারের স্থায়িত্ব প্রয়োজন। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার সংকল্প বিজেপিরই। সুতরাং বিকশিত ভারতের স্বার্থে যুবসমাজকে দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

হিন্দু জাতীয়তাবোধের জনক
ঋষি রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর লেখালেখি, বক্তৃতা ও অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবোধের পথ চলা শুরু হয়, যা আজ ভারতবর্ষীয় মানস পরিব্যাপ্ত করেছে।

ড. অয়ন ব্যানার্জী

আধুনিক ভারতবর্ষে আরও অনেক কিছুর মতোই হিন্দু জাতীয়তাবোধের চিন্তাও বাঙ্গালিদেরই অবদান। সামাজিক সংগঠন, সাহিত্য, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা সকলক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবোধের ধারণার পরিসর তৈরি করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ-র মতো কৃতী বাঙ্গালি সন্তানরা।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালির মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি অবজ্ঞার মনোভাব ও খ্রিস্টমতের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এই শতকেরই দ্বিতীয় ভাগে এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্যার উইলিয়ম জোন্স এবং এইচ.টি. প্রিন্সেপ-এর মতো প্রাচ্যবিদদের কাজকর্ম, আলেকজান্ডার ক্যানিংহামের বিভিন্ন খননকার্য এবং ম্যাক্সমূলার, উইলসন, ফারগুসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্যদের লেখালেখির ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীয়রা সচেতন হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রিস ও রোমের তুলনায় কিছু কম গৌরবোজ্জ্বল ছিল না। ইউরোপীয় বিদ্বানরা দেখান যে হিন্দু ও ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষরা একই জাতিভুক্ত ছিলেন, বৈদিক সাহিত্য হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য এবং উপনিষদে আছে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক চিন্তাভাবনাসমূহ। জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী লিপি পাঠোদ্ধার করার ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা জানতে পারেন যে, মৌর্য সম্রাট অশোকের অধীনে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান ছিল।

ঊনবিংশ শতকে বঙ্গের অন্যতম মনীষী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ সাল)-কে 'ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন যে, বঙ্গে প্রথম খোলাখুলিভাবে জাতীয়তার কথা বলতে শুরু করেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি। অধ্যাপক কমল কুমার ঘটক তাঁর গ্রন্থ 'Hindu Revivalism in Bengal : Rammohun to Ramakrishna'-এ বলেছেন, রাজনারায়ণ বসু ছিলেন হিন্দু পুনর্জাগরণের উদ্গাতা। ১৮৬৬ সালে তিনি ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন— 'Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামে। রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাভাবনারই বাস্তবায়ন ঘটান নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলা' আয়োজনের মাধ্যমে। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, হিন্দুমেলা বঙ্গে জাতীয়তাবোধের বিকাশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল সোসাইটি'-র উদ্যোগে ১৮৭২ সালে ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এই সভার বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতাটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। সেই সময়ের সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বলেন যে--- 'হিন্দু ধর্ম্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন।' রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সে যুগের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের ও ব্রাহ্ম নেতার হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রসারেই সহায়তা করে। কমল কুমার ঘটক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, রাজনারায়ণ বসু ছিলেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের উদ্গাতা। তাঁর অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। বিপিন চন্দ্র পাল লেখেন, 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা-র ওপর তাঁর বাংলায় বক্তব্যটি ছিল ইউরোপের আক্রমণাত্মক চিন্তাভাবনা ও সভ্যতার প্রতি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রথম চ্যালেঞ্জ।'

রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবোধের চিন্তাকে সবল করার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। 'The Old Hindu's Hope' বা 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' শীর্ষক পুস্তিকায় রাজনারায়ণ এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রাজনারায়ণ ইসলাম ও খ্রিস্টান মতাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেন। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মদের হিন্দুধর্মের অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে তিনি ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'মহাহিন্দু সমিতি' নামে একটি সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব দেন।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে যে জাতীয়তাবোধের তথা হিন্দু জাতীয়তাবোধের চিন্তার সূত্রপাত হয় অখণ্ড বঙ্গে— তারই অন্যতম উদ্গাতা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল সোসাইটি' তৈরি

করেন হিন্দুমেলার চার বছর হয়ে যাওয়ার পর। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের চেতনার জাগরণ ঘটানো। প্রত্যেক মাসে একবার তাঁরা মিলিত হতেন এবং ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ চেতনার ওপর বক্তৃতা হতো। এইভাবেই একবার রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের মহানতা ও শ্রেষ্ঠত্বে-র ওপর বক্তব্য রাখেন। এই বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ একটি পুস্তিকা রূপে বেরোয় এবং ১২৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র এর একটি পর্যালোচনা বের করেন। রাজনারায়ণ বসু বলেন, 'আমি আশা করি যে হিন্দু জাতি পুনরায় তার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতা ফিরে পাক যার জন্য সে প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল।

হিন্দুমেলা ১৮৬৭-তে শুরু হয়ে ১৮৮০ পর্যন্ত প্রত্যেক বছর আয়োজিত হয়েছিল। হিন্দুমেলার উৎপত্তি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'বাবু নবগোপাল মিত্র প্রথম হিন্দু মেলা আয়োজন করার কথা ভাবেন আমার 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' সংক্রান্ত লেখাটি পড়ে। এটা তিনি আমার সামনে কোনোরকম ইতস্তত না করেই স্বীকার করেন। 'হিন্দুমেলা' শুরু করার পর নবগোপালবাবু ন্যাশনাল সোসাইটি গঠন করেন এটি পরিচালনা করার জন্য। এই সোসাইটিটি আমার পরিকল্পিত 'সভা'র অনুকরণেই গঠিত হয়।'

১৮৭৬ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'স্বদেশানুরাগ' বলে একটি প্রবন্ধ ছাপানো হয়। এতে বলা হয় যে, ইংরেজি শিক্ষা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষজন নিজের ধর্ম, প্রথা, আচার-আচরণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। কিন্তু বর্তমান (১৮৭৬ সাল) ইংরেজি শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের মধ্যে এই ভাবনার বদল ঘটেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব এবং হিন্দু ধর্ম ও তার প্রথা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রশংসনীয় কথাবার্তা কোনো সভায় হলে মানুষ এখন তা অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে শোনে। মানুষ এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পরম সত্যকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, অন্য ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিতে তা বিরল এবং তারা এও বিশ্বাস করে যে, হিন্দু ধর্মে এমন অনেক প্রথা রয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য এবং তা অন্যান্য ধর্মগুলিতে পাওয়া যায় না। মানুষের মনে ধীরে ধীরে এখন দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিজের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব হ্রাস পাচ্ছে। —'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার এই প্রবন্ধের লেখক ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের থেকে দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালির চিন্তাভাবনার এই পার্থক্যের জন্য কতকগুলি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এরমধ্যে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক একটি জাতীয় সমিতি গঠনের প্রস্তাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা লেখা এবং সেই অনুযায়ী নবগোপাল মিত্র কর্তৃক 'হিন্দু মেলা'-র আয়োজন ও 'ন্যাশনাল সোসাইটি' গঠনকে।

হিন্দুমেলার উদ্যোক্তারা হিন্দু জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববোধের অভিমান জাগরিত করার জন্য চৈত্র সংক্রান্তির সময় হিন্দুমেলার বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করতেন। এই মেলায় কুটির শিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হতো। এর সঙ্গে থাকত শিল্প প্রদর্শনী ও দেশীয় খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। মেলায় সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো। সব বিভাগেই পুরস্কারের বন্দোবস্ত ছিল। হিন্দু মেলাতে নবগোপাল মিত্র জিমন্যাস্টিক, কুস্তি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খেলার ওপর জোর দেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, 'হিন্দুমেলাকে (চৈত্রমেলা) আমরা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্পন্দন বলতে পারি।'

হিন্দুমেলা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেশীয় কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে হিন্দু মেলা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিল দেশীয় শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর একটি দেশরূপে গড়ে তুলতে। এর বহু দশক পরে বিংশ শতকের প্রথম ভাগে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগেই হিন্দুমেলার আয়োজনকারীরা এই ধরনের ভাবনা ভেবেছিলেন।

হিন্দুমেলার আর্থিক দায়ভার অনেকটাই বহন করত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন স্মৃতি'-তে হিন্দু মেলার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালক বয়সে নিয়মিত কবিতাও পড়তেন এই মেলায়। ১৮৭৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ বড়লাট লিটনসাহেব দিল্লি দরবারের আহ্বান করেন। সেখানে দেশীয় নৃপতিদের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেন। সেটি ১৮৭৭-এ হিন্দু মেলার অধিবেশনে পাঠ করেন। এর অংশবিশেষ হলো—

'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি
আমরা ধরিব আর এক তান।'

বহু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, হিন্দুমেলা ছিল হিন্দুদের জাতীয় চেতনার প্রথম প্রকাশ। মেলার কার্যবিবরণী থেকে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। অধ্যাপক কমল কুমার ঘটক তাঁর গ্রন্থ 'Hindu Revivalism in Bengal : Rammohun to Ramakrishna'-এ বলেছেন, 'মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের পুরনো গৌরবের পুনর্জাগরণ ঘটানো। এর নেতারা স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও হিন্দুধর্মের কথা এক নিঃশ্বাসে বলতেন এবং এর মধ্যে কোনো পারস্পরিক বিরোধ দেখতে পেতেন না।' এই মেলার অন্যতম সদস্য মনমোহন বসু ১৮৬৮-তে বলেন, 'এই মেলার মাধ্যমেই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও হিন্দুদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।' বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর 'History of Moden Bengal, Part-One' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৮০-৩৮১) মন্তব্য করেছেন, 'ভারতবর্ষে জাতীয়তার প্রধান অবলম্বনই হলো হিন্দু ধর্ম, কথাটি শুনতে অপ্রীতিকর লাগলেও এটি অস্বীকার করা কোনোমতেই সম্ভব নয়।'

এইভাবেই রাজনারায়ণ বসুর লেখালেখি, বক্তৃতা ও অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবোধের পথ চলা শুরু হয়, যা আজ ভারতবর্ষীয় মানস পরিব্যাপ্ত করেছে। □

লাল সন্ত্রাসের শরশয্যায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতামহ

ঋষি রাজনারায়ণ বসু

ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রথম পর্ব)

মানিকতলার অন্ধকার কুঠুরিতে উপনিষদের আলো : কলকাতার বুকে তখন ১৮৭৬ সালের ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির গলিপথ পেরিয়ে মানিকতলার এক নির্জন, ভগ্নপ্রায়, পোড়ো বাড়ি। সদর দরজায় তিনটি মৃদু আঘাত, পরক্ষণেই নিঃশব্দে খুলে গেল ভারী দরজা। অন্ধকার ঘরের মধ্যে টিমটিম করে জ্বলছে একটিমাত্র রেড়ির তেলের প্রদীপ। গৃহের মধ্যস্থলে আসন পেতে বসে আছেন একদল তরুণ, যাঁদের পরনে ধুতি আর দেশি তাঁতের উত্তরীয়। চারপাশ নিস্তব্ধ, বাতাসে ধূপের সুবাস। হঠাৎ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বৈদিক মন্ত্র, আর সেই মন্ত্রোচ্চারণের পর সমবেত কণ্ঠে গাওয়া শুরু হলো এক হৃদয়স্পর্শী স্বদেশী গান— 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ...'। গানটি যিনি গাইছেন, তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর প্রদীপের মৃদু শিখায় সেই তরুণের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রুপালি শুভ্র শ্মশ্রুশোভিত, প্রশান্ত নয়নের এক প্রৌঢ় ঋষিতুল্য পুরুষ। তাঁর চোখে জল, কিন্তু বুকের ভেতরে জ্বলছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল চূর্ণ করার এক অপ্রতিরোধ্য বহ্নিশিখা।

তিনি রাজনারায়ণ বসু। সেদিনের সেই গুপ্ত সভার নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'; যার সাংকেতিক নাম ছিল 'হামচু পামু হাফ'। ইতালির বিপ্লবী কার্বোনারি আন্দোলনের আদলে তৈরি এই গোপন সমিতির তিনিই ছিলেন সভাপতি। কিশোর রবীন্দ্রনাথকে



যে মানুষটি ছিলেন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মাতামহ, রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের স্বাদেশিক দীক্ষাগুরু এবং স্বামী বিবেকানন্দের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্যেষ্ঠ পথপ্রদর্শক;স্বাধীনোত্তর ভারতের কমিউনিস্ট, নকশালপন্থী ও মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চায় তাঁকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। তাঁকে চিহ্নিত করা হলো— 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদী', 'সামন্ততান্ত্রিক মুৎসুদ্দি', 'পশ্চাৎপদ বুর্জোয়া', এমনকী 'দ্বিজাতি তত্ত্বের আদি পিতা' হিসেবে।

স্বাদেশিকতার দীক্ষায় যিনি এভাবে ঘরের নিভৃতে দীক্ষিত করছিলেন, তিনি কোনো পেশাদার রাজনীতিবিদের চাতুর্য নিয়ে আসেননি; এসেছিলেন এক আত্মনিবেদিত ঋষির ত্যাগের দ্যুতি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে সেই আশ্চর্য দিনগুলির কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন যে, রাজনারায়ণবাবুর শুভ্র কেশ আর দাড়ির অন্তরালে লুকিয়ে ছিল এক চিরনবীন, চিরকিশোর আত্মা, যিনি দেশকে ভালোবেসে সমস্ত কৃত্রিম সংস্কারকে ধূলিসাৎ করতে দ্বিধা করেননি।

অথচ এই রাজনারায়ণের পূর্বজীবন ছিল একেবারেই বিপরীত মেরুতে। ১৮২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ অনুগামী ও সেক্রেটারি। বাল্যকালে হেয়ার স্কুল ও পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র রাজনারায়ণ যখন ডিরোজিওর 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ছিলেন ইউরোপীয় র‍্যাডিক্যাল দর্শনে পুরোপুরি নিমজ্জিত। তৎকালীন হিন্দু কলেজের বহু যুবকের মতোই তিনি সংস্কারভাঙার নামে বিলাতি মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণকে প্রগতির ছাড়পত্র বলে ধরে নিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত অনন্য আত্মস্মৃতি 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' (কুন্তলীন প্রেস, কলকাতা, ১৯০৯)-এ কোনো রাখঢাক না রেখে চরম সততার সঙ্গে স্বীকার করেছেন সেই উদ্দাম জীবনের কথা। অতিরিক্ত মদ্যপান তাঁর শরীরকে ভেঙে দেয়, দেখা দেয় গুরুতর স্নায়ুরোগ, যার ফলে ১৮৪৪-৪৫ সালে তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। এর ওপর নেমে আসে পারিবারিক বজ্রাঘাত;

প্রথমা স্ত্রী প্রসন্নময়ী মিত্রের আকস্মিক প্রয়াণ এবং ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বরে পিতা নন্দকিশোরের মৃত্যু।

রোগশয্যায় শুয়ে গভীর অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত তরুণ রাজনারায়ণ অনুভব করলেন এক নিদারুণ আত্মিক শূন্যতা। পাশ্চাত্য সংশয়বাদ তাঁর অন্তরের হাহাকারকে মেটাতে পারছিল না। তিনি নিবিড়ভাবে পাঠ করতে শুরু করলেন বেদান্ত, উপনিষদ, খ্রিস্টান একেশ্বরবাদী সাহিত্য এবং ফার্সি সুফি কবিতা। ঠিক এই সময়েই তাঁর জীবনে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৬ সালে মহর্ষি তাঁকে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত করলেন। শুরু হলো এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক রূপান্তর। দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান স্তম্ভে পরিণত হলেন। ইউরোপীয় দর্শনের মোহমুক্ত হয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ভারতের মুক্তি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে নেই, ভারতের মুক্তি নিহিত রয়েছে তার নিজস্ব প্রাচীন বেদান্ত, উপনিষদ ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুগভীর আত্মমর্যাদার পুনরুজ্জীবনে। এই আধ্যাত্মিক আত্মপ্রত্যয়ের শ্রেষ্ঠ বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৮৭২ সালে কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বর্তমান বিধান সরণীর) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভবনে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসু এক স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন, যা ১৮৭৩ সালে বাল্মীকি প্রেস থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়— 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'। সেদিন তাঁর সেই বজ্রনির্ঘোষ বক্তৃতা শুনতে ভেঙে পড়েছিল কলকাতার শিক্ষিত সমাজ। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা শিবচন্দ্র গুহ পর্যন্ত আবেগে আপ্লুত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, রাজনারায়ণবাবুর একটি মার্বেল মূর্তি স্থাপন করা উচিত। এক সমকালীন সাংবাদিক লিখেছিলেন— 'হিন্দুধর্ম যখন গভীর সংকটে তলিয়ে যাচ্ছিল, রাজনারায়ণই সেদিন তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন।' তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন— 'যতদিন আমাদের ধমনীতে আর্য রক্তের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত প্রবাহিত থাকবে, ততদিন আমরা হিন্দুর নাম ত্যাগ করব না।'

অথচ কী নির্মম ঐতিহাসিক পরিহাস! যে মানুষটি ছিলেন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মাতামহ, রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের স্বাদেশিক দীক্ষাগুরু এবং স্বামী বিবেকানন্দের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্যেষ্ঠ পথপ্রদর্শক; স্বাধীনোত্তর ভারতের কমিউনিস্ট, নকশালপন্থী ও মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চায় তাঁকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। তাঁকে চিহ্নিত করা হলো— 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদী', 'সামন্ততান্ত্রিক মুৎসুদ্দি', 'পশ্চাৎপদ বুর্জোয়া', এমনকী 'দ্বিজাতি তত্ত্বের আদি পিতা' হিসেবে।

স্বাদেশিকতার সংকল্পপত্র ও হিন্দুমেলা : রাজনারায়ণ বসুর রাজনৈতিক চিন্তার মূল সুরটি কখনোই নিছক ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতার রাজনীতি ছিল না; তা ছিল এক সর্বাঙ্গীণ জাতীয় পুনরুজ্জীবন। ১৮৫১ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জিলা স্কুলের (পরবর্তীকালে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল) প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে শিক্ষা মানে কেরানি তৈরির কারখানা নয়, শিক্ষা হলো চরিত্র গঠনের মহাযজ্ঞ। তিনি স্কুলে শারীরিক প্রহার প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন, মুখস্থ বিদ্যার বদলে সক্রেটিক প্রশ্নোত্তরের সূচনা করেন, ছাত্রদের মেরুদণ্ড ঠিক রাখার জন্য পিঠওয়ালা বেঞ্চের ব্যবস্থা করেন এবং ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমান ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে নিজের দুই সহোদর ভাই দুর্গানারায়ণ ও মদনমোহনের বিধবাবিবাহ দিয়ে পারিবারিক স্তরে সামাজিক বিপ্লব ঘটান এবং ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গের প্রথম 'সুরাপান নিবারণী সভা'।

কিন্তু তাঁর রাষ্ট্র ভাবনার ঐতিহাসিক মাইলফলক রচিত হয়েছিল ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' এবং ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর সেই সুবিখ্যাত পুস্তিকা—'Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal'। নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত 'The National Paper'-এ ১৮৬৬-১৮৬৭ সালে মুদ্রিত এই দলিলটিকে পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আর্কাইভের নথিতে যথার্থভাবেই মূল্যায়ন করা হয়েছে 'ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী ইশতাহার' (really the first National Manifesto of India) হিসেবে। রাজনারায়ণ এই তাতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন— 'জাতীয় অনুভূতির যথাযথ চর্চা ব্যতিরেকে কোনো জাতিই প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে না। সমগ্র ইতিহাসই এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে।' তিনি নয় দফা কর্মসূচির রূপরেখা দিয়েছিলেন— যেখানে দেশীয় ব্যায়াম ও কুস্তির পুনরুজ্জীবন, জাতীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র বা আয়ুর্বেদের বিকাশ, মাতৃভাষায় ইতিহাস রচনা, সংস্কৃত চর্চা এবং সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজির অপমিশ্রণ বর্জন করে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই সংকল্পপত্রের আলোকেই ১৮৬৭ সালে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর যৌথ উদ্যোগে জন্ম নেয় ঐতিহাসিক 'হিন্দুমেলা' (বা জাতীয় মেলা)। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত চলা এই মেলা ছিল ভারতের মাটিতে আধুনিক অর্থনৈতিক স্বদেশী ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের প্রথম আনুষ্ঠানিক উন্মেষ। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ— History of the Freedom Movement in India (প্রথম খণ্ড, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৬)-এ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন যে, রাজনারায়ণ বসুই ছিলেন আধুনিক ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদি পথপ্রদর্শক। তিনি কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করেননি, বরং ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতায় ভোগা এক পদানত জাতিকে শিখিয়েছিলেন নিজেদের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে। রমেশচন্দ্র মজুমদার উদ্ধৃত করেছেন রাজনারায়ণের সেই প্রদীপ্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী— 'আমি আমার মানসপটে দেখতে পাচ্ছি; সেই মহিমান্বিত ও বলবান হিন্দু জাতি সুদীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রত হচ্ছে

এবং দিব্য বিক্রমে প্রগতির পথে ধাবিত হচ্ছে... সেই পুনরুজ্জীবিত জাতি পুনরায় তার জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করছে।'

১৮৭৩-৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর অবিস্মরণীয় সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ 'সেকাল আর একাল'-এ তিনি কোম্পানির আমলের প্রথম পর্বের বঙ্গীয়সমাজের সঙ্গে তাঁর সমকালের ঔপনিবেশিক অধীনস্থ বঙ্গীয়সমাজের তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদ করেন। সেখানে তিনি দেখান, কীভাবে বিলাতি শিক্ষার যান্ত্রিক প্রভাবে বাঙ্গালি তার শারীরিক বলবীর্য, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক আতিথেয়তা হারিয়ে এক ক্লীব, রোগগ্রস্ত, দশটা-চারটার কেরানি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকায় তিনি সমগ্র ভারতের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 'মহা হিন্দু সমিতি' গঠনের ডাক দেন এবং সর্বভারতীয় যোগাযোগের জন্য হিন্দিকে সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর Memories of My Life and Times (মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৩২) আত্মজীবনীতে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, রাজনারায়ণ বসু নিছক একজন সুবক্তা বা লেখক ছিলেন না; তিনি ছিলেন আধুনিকতা ও আত্মমর্যাদার এক জীবন্ত মেলবন্ধন, যিনি ব্রিটিশের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মুখে দাঁড়িয়ে প্রথম চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখিয়েছিলেন।

মার্ক্সবাদী ইতিহাসতত্ত্বে স্বাদেশিকতাকে 'সাম্প্রদায়িক' বানানোর ছক : স্বাধীনতার পর ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে যখন মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন রাজনারায়ণ বসুর এই গৌরবময় স্বাদেশিক ঐতিহ্য এক তীব্র মতাদর্শিক বাধার সম্মুখীন হলো। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং লেনিনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী 'ধর্ম' হলো 'জনগণের আফিম'। ফলে যে জাতীয়তাবোধ হিন্দু ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত, তাকে প্রগতিশীল বলে স্বীকার করা মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কমিউনিস্ট পণ্ডিতরা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের আত্মিক সত্তাকে ধ্বংস করতে এক চতুর্মুখী রণকৌশল গ্রহণ করলেন— শ্রেণীর নামে খাটো করা, নবজাগরণকে অস্বীকার করা, হিন্দু শব্দটিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে দেগে দেওয়া এবং কার্যকারণ সম্পর্ককে উল্টে দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা।

এই বিকৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রজনী পাম দত্ত তাঁর India Today (ভিক্টর গোলান্চ, লন্ডন, ১৯৪০) গ্রন্থে এবং এ. আর. দেশাই তাঁর Social Background of Indian Nationalism (১৯৪৮) গ্রন্থে। সেখানে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে স্রেফ বুর্জোয়া ও ভূস্বামী শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থরক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। বাঙ্গলার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার এই ধারার সূত্রপাত ঘটালেন সুশোভন সরকার তাঁর Notes on the Bengal Renaissance (পিপ্‌ল্‌স্‌ পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই, ১৯৪৬) পুস্তিকায়। সুশোভন সরকার পরবর্তীকালে Bengal Renaissance and Other Essays (১৯৭০) এবং On the Bengal Renaissance (১৯৭৯)-এ কিছুটা নমনীয় হওয়ার ভান করলেও তাঁর মূল ছকটি বজায় ছিল; যেখানে রাজা রামমোহন রায় বা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো চরিত্রদের কিছুটা স্থান দেওয়া হলেও রাজনারায়ণের মতো হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণাকারী ঋষিদের ঠেলে দেওয়া হলো 'পশ্চাৎপদ পুনরুত্থানবাদী'র অন্ধকার কোণে।

এই আক্রমণ চরম রূপ ধারণ করল ১৯৭০-এর দশকে। মার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ তাঁর প্রথম জীবনের প্রশংসাসূচক অবস্থান ১৮০ ডিগ্রি বদলে ফেললেন। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণে (১৯৭৮-৭৯) তিনি যোগ করলেন এক কুখ্যাত পোস্টস্ক্রিপ্ট— 'বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা'। তিনি কার্ল মার্ক্সের ১৮৫৩ সালের নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনের প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করে দাবি করলেন যে, উনিশ শতকের 'নবজাগরণ' কোনো নবজাগরণই ছিল না, তা ছিল এক ঐতিহাসিক ধাপ্পাবাজি বা মিথ। গোপাল হালদার তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪৪) এবং পরবর্তীকালে 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ' গ্রন্থে দাবি করলেন যে উনিশ শতকের আন্দোলন ছিল সমাজের এক আণুবীক্ষণিক 'বাবু কালচারের' বিলাসিতা। নরহরি কবিরাজ তাঁর 'উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক' গ্রন্থে একই সুরে গান গাইলেন।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর ২০১৫ সালের গবেষণাপত্র Bengali Marxists and the Bengal Renaissance-এ এই কমিউনিস্ট সংকীর্ণতাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলীর (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৬) উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ১৮৯৭ সালে সুইস অর্থনীতিবিদ সিসমন্ডিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন স্পষ্ট বলেছিলেন— 'ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অবদানকে আধুনিককালের চাহিদার নিরিখে বিচার করা যায় না; বিচার করতে হয় তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরিদের তুলনায় সমাজকে কতটা নতুন কিছু দিতে পেরেছিলেন।' রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাঙ্গালি মার্ক্সবাদীরা স্বয়ং লেনিনের শিক্ষা লঙ্ঘন করে উনিশ শতকের মনীষীদের ওপর বিংশ শতাব্দীর লেনিনবাদী মানদণ্ড চাপিয়ে চরিত্রহনন করেছেন।

আরও ধ্বংসাত্মক তাত্ত্বিক আক্রমণ নেমে এলো বিবিসি ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক্সবাদী চক্র থেকে। অধ্যাপক বিপান চন্দ্র তাঁর বহুলপ্রচারিত গ্রন্থ 'Communalism in Modern India' (বিকাশ পাবলিশিং, নয়াদিল্লি, ১৯৮৪) এবং রোমিলা থাপার ও হরবংশ মুখিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে রচিত 'Communalism and the Writing of Indian History' (পিপ্‌ল্‌স্‌ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯)-এ এক কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল— যেকোনো আন্দোলন যা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের কথা বলে, তা বৈধ জাতীয়তাবাদ নয়, তা প্রকারান্তরে 'সাম্প্রদায়িকতা'। এই একতরফা সংজ্ঞার ফাঁদে ফেলে বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুকেও

এক নিঃশ্বাসে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো।

ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার তাঁর 'Modern India 1885-1947' (ম্যাকমিলান, ১৯৮৩) এবং 'A Critique of Colonial India' (প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০০) গ্রন্থে আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করলেন যে, নবজাগরণ ছিল এক 'হিন্দু-এলিট এবং ঔপনিবেশিক মুৎসুদ্দিদের বন্দিদশা'। সুমিত সরকার তাঁর 'Writing Social History' (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭) গ্রন্থে রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল'-এর স্বাস্থ্য ও নৈতিক অধঃপতনের কান্নাকে এক নিষ্ঠুর বস্তুবাদী উপহাসে পর্যবসিত করলেন। তাঁর মতে, রাজনারায়ণের আক্ষেপ আসলে কিছুই নয়, তা ছিল কলকাতার কেরানি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া ছোট তালুকদার শ্রেণীর 'গ্রামীণ স্মৃতিমেদুরতা' (rural retrospect) এবং ঔপনিবেশিক চাকরির জাঁতাকলে পিষ্ট মধ্যবিত্তের ক্ষোভ মাত্র!

পরবর্তীকালে সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার তাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Our Modernity' (১৯৯৭) এবং 'The Nation and Its Fragments' (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩) গ্রন্থে রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধকে একটি 'অবরোহী ডিসকোর্স' (derivative discourse) বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁর দাবি, এই ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীরা বৃহত্তর কৃষক ও মুসলমানদের বাদ দিয়ে কেবল নিজেদের অভ্যন্তরীণ আত্মমর্যাদার বলয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অমিয় প্রসাদ সেন তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'Hindu Revivalism in Bengal 1872-1905' (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩) এবং সাম্প্রতিক গবেষণামূলক গ্রন্থ 'Hindutva Before Hindutva' (২০২৪)-এ দেখিয়েছেন কীভাবে আধুনিক মার্ক্সবাদী ও বাম গোষ্ঠী রাজনারায়ণের ১৮৮৭ সালের 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'র একটি বিচ্ছিন্ন বাক্যকে তুলে ধরে তাঁকে বর্তমান হিন্দুত্ব রাজনীতির আদি নকশাকার বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। অথচ সত্যটি হলো, রাজনারায়ণের কাছে 'হিন্দু' শব্দটি কোনো সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা ছিল না; তা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক ভৌগোলিক ও সভ্যতাগত প্রতিরোধ।

সত্তরের নকশালবাদী সন্ত্রাস ও বিদ্যায়তনিক ধ্বংসযজ্ঞ : যদি মার্ক্সবাদী ইতিহাসতাত্ত্বিকদের যাবতীয় আক্রমণ কলমের খোঁচায় সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, তবে নকশালবাড়ি আন্দোলন সেই মতাদর্শগত বিষকে রাজপথের সশস্ত্র বর্বরতায় রূপান্তরিত করেছিল। ১৯৬৭ সালের মে মাসে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া গ্রামে যে কৃষক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল, তা ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিআই(এম-এল) গঠনের মধ্য দিয়ে এক সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসে রূপ নেয়। মাও-সে-তুং-এর চীনা সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (১৯৬৬-১৯৬৯) অন্ধ অনুকরণে চারু মজুমদার ও তাঁর দল ঘোষণা করে— ভারতের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ 'আধাসামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশিক'; নতুন সমাজ গড়তে হলে পুরোনো সবকিছুকে ধূলিসাৎ করতে হবে। মাওয়ের সেই কুখ্যাত স্লোগান ধার করা হলো— 'না ভাঙলে গড়া যায় না!'

১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কলকাতা এবং মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলা শহরে শুরু হলো কুখ্যাত 'মূর্তি ভাঙা আন্দোলন'। কলেজ স্ট্রিট, প্রেসিডেন্সি কলেজ (রাজনারায়ণের নিজের কলেজ), সংস্কৃত কলেজ (যেখানে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছিলেন) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। ক্লাসরুম দখল করে টাঙিয়ে দেওয়া হলো চেয়ারম্যান মাওয়ের দানবীয় প্রতিকৃতি, লাইব্রেরিতে ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন, ল্যাবরেটরি পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো। সেনেট হল ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হলো। ভবানী দত্ত লেন পরিণত হলো নকশালদের তথাকথিত 'মুক্তাঞ্চল'-এ।

সিপিআই(এম-এল)-এর রাজ্য সম্পাদক ও মুখপাত্র সরোজ দত্ত (যিনি 'শশাঙ্ক' ছদ্মনামে লিখতেন), পার্টির মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকায় এক বিষাক্ত নিবন্ধমালা রচনা করলেন। তাঁর লেখা 'মূর্তি ভাঙার সমর্থনে' (১৯৭০) এবং 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' (পরবর্তীকালে 'সরোজ দত্ত রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, প্রণতি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩ গ্রন্থে সংকলিত) প্রবন্ধে তিনি নির্লজ্জভাবে এই ভাঙচুরকে ন্যায্যতা দিলেন। সরোজ দত্ত লিখলেন— বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিম কিংবা রবীন্দ্রনাথ হলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'দালাল' এবং 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া পুতুল'। যতদিন না বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ এই দালালদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো বন্ধ করবে, ততদিন বিপ্লবী চেতনা জাগবে না। চারু মজুমদার স্বয়ং 'Liberation'(আগস্ট ১৯৭০) পত্রিকায় লিখেছিলেন— 'এই দালালদের মূর্তি ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী ভারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অতএব ছাত্র-যুবকদের এই কাজ নিঃসন্দেহে বিপ্লবী কাজ।'

প্রখ্যাত গবেষক ও প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিশদ গবেষণামূলক গ্রন্থ— Maoist 'Spring Thunder'- The Naxalite Movement 1967-1972 (কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৭)-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোপন নথির ভিত্তিতে এক চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৭০ সালের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১,২৫৭টি মূর্তি ভাঙচুর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছিল, যার মধ্যে কেবল কলকাতাতেই ঘটেছিল ৩৭৬টি ঘটনা! বিদ্যাসাগরের মার্বেলের আবক্ষ মূর্তি কলেজ স্কোয়ারে শিরশ্ছেদ করা হলো, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামমোহন রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, এমনকী গান্ধীজীর মূর্তিও রেহাই পেল না। সম্রাট সেনগুপ্ত এবং সৈকত মৈত্র তাঁদের গবেষণাপত্র— The Cultural Politics of 'Spring Thunder'- The Naxalbari Movement and the Re-framing of Bengali Culture in the 1960s (Internationales Asienforum, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০/২০২১, পৃষ্ঠা ২৮৩-৩১১)-এ দেখিয়েছেন কীভাবে নবজাগরণের সম্পূর্ণ ঐতিহ্যকে 'শ্রেণীশত্রুর সংস্কৃতি' আখ্যা দিয়ে এক চরম সাংস্কৃতিক নিধনযজ্ঞ চালানো হয়েছিল।

(পরের সংখ্যায় সমাপ্ত)

দীর্ঘ ৪০ বৎসর পরে, কলিকাতা শহরে, পুনরায় রোগী দেখবেন

ডাঃ বিমল কুমার রাজ [From 15.12.2026 / ১৫.১২.২০২৬ হইতে]

Dr. BIMAL KUMAR RAJ
Regn. No. 42743 (W.B. Medical Council)

- MD (1st Class, Gold Medallist,Cal-U), DGO (1st Class,Cal-U), MBBS (1st Class, Hons., Cal-U)
- MHSC - Diabetology (1st Class, Hons. & Star *) PGD - Reproductive & Sexual Medicine (1st Class, Hons. & Star *), FICMCH, FIAOG, Gold Medallist, LLB, LLM.

Senior Consultant Gynaecologist, Obstetrician, Infertility Specialist, Diabetologist,
Reproductive and Sexual Medicine Specialist & Medico Legal Consultant

Gold Medal Awardee-2019 for Best Gynaecology & Infertility Practice in India by Global Economic Progress & Research Association (GEPRA)- (New Delhi)

Letters of appreciation Received from :

- Prof. Dr. Christian de Duve, **Nobel Laureate** in Medicine-1974, ICP, Paris.
- Prof. Dr. P.C. Stepto, Edinburg, **Nobel Laureate**, (1st Test Tube Baby of the World.)
- Prof. Dr. J.B. Walter, MD, Toronto, Canada (Author of World famous **"Walter & Israel's Pathology Book")**
- Prof. Dr. Sir John Crofton , Edinburg, [Author of Pulmonary disease & **Tuberculosis Text Book.**]

Gyne-Surgery-Medicine-Pathology Training Received from (Pedigree/Guruparampara) :

- Prof. Dr. B. N. Chakraborty, MD. FRCOG, DSc., famous for **2nd Test Tube Baby of world & 1st in Asia. IRM, Kolkata.**
- Prof. Dr. Samir Kumar Basu, FRCS, FRCOG, DA (Lond), DLO (Lond), Asso with **Prof. Subodh Mitra & Prof. Green-Armytage)**
- Prof. Dr. Manotosh Mukherjee, FRCOG , **(Registrar of Sir John Dewhurst & Father of Infertility Teaching in India)**
- Prof. Dr. Subir Chatterjee, MB, FRCS, PHD. (World Famous Paediatric Surgeon)
- Prof. Dr. Asoke Bagchi , MBBS (Hons.), MSCNS (Vienna), FNS(Vienna),FACS,FICS PHD, D-Lit (World Famous Neurosurgeon)
- Prof. Dr. Shambhu Nath De , MD. , FRCP, (Selected for **Nobel Prize**, but died 3 days before receiving letter)
- Prof. Dr. Subir Kumar Datta, MD, famous Pathologist & Microbiologist, Kolkata, India & Several others etc. etc.

DR. RITUPARNA RAJ (SARKAR) , MD, DNB, MRCOG-I | **DR. ANINDYA SARKAR, MD, DM, MRCP-II (U.K.)**

Dr. BIMAL KUMAR RAJ will see the following group of patients

Group A : Primary and Secondary Amenorrhoea (With Complication) and Primary & Secondary Infertility with Complications like Repeated I.V.F Failure, Repeated Pregnancy Abortions Without I.V.F.

Group B : Male and Female Sexual Dysfunctions.

Group C : Anti-Ageing & Age-Reversal.

Group D : Hepatomegaly, Fatty Liver Gr-I & II, Steatosis, Dyslipidemia.

Group E : Complicated Diabetes with Compromised Kidney functions.

Group F : All Types of Complicated Gynae & Obstetric Patients.

Group G: Consultation for Autism.

Group H : Hirsutism, P.C.O.D, Obesity, Gross Obesity etc.

MAXm Fee - per visit- 1000/- (Autism),1500/- (Mid+Kgp), 3000/- (Cal)

Address : RAJ NURSING HOME & INFERTILITY CENTRE, KAUSHALYA MORE, KHARAGPUR, W.B. 721301

Calcutta Chamber : New Mediclue Diagnostics, 68 Chowringhee Rd, Oppo. Rabindrasadan Metro Station Gate - 4
Visiting Days : Tuesday - 11 AM to 2 PM. Contact No. : Mr. T Ahmed- 9830955293, 9434055000

Midnapore Chamber : Raj Nursing Home, Rabindra Nagar, Midnapore. Contact No.- 03222-263884, 9434055000
Visiting Days : Mon / Wed / Fri / Sunday - 10 AM to 2 PM

Kharagpur Chamber : Raj Nursing Home, Kaushalya, Kharagpur. Contact No. 03222 - 255777, 9434055000
Visiting Days : Mon / Wed / Fri / Sunday - 4 PM to 6 PM

****N.B. : Calcutta chamber patients :- By prior appointment only.**



প্রয়াত প্রচারক সুন্দর পালের স্মরণে দ্বারহাট্টায় শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

আনন্দ মোহন দাস

গত ১১ নভেম্বর, বুধবার বিকেল ৪টায় প্রায় দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা শাখার উদ্যোগে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশু মন্দিরে প্রয়াত বরিষ্ঠ প্রচারক সুন্দর পালের স্মরণে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়।

সুন্দর পাল ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন বরিষ্ঠ প্রচারক। তিনি বিজেপির অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা প্রদেশের প্রাক্তন সংগঠন সম্পাদক এবং তারপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ও প্রবীণ প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাসরায়, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদক মধুময় নাথ, হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক সুনীল বাগ।

এছাড়াও প্রয়াত প্রচারক সুন্দর পালের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, হরিপাল ও সিঙ্গুর বিধানসভার দুই জনপ্রতিনিধি-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও পরিবারের সদস্যরা সুন্দর পালের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গীতাপাঠ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার পাঠানো শোকবার্তা পাঠ করে শোনানো হয়।

প্রসঙ্গত, তাঁর অকালপ্রয়াণে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল এবং অসম প্রদেশ বিজেপির সভাপতি দিলীপ সইকিয়া-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

স্মৃতিচারণ পর্বে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুন্দর পালের দীর্ঘ প্রচারক জীবন, সাংগঠনিক দক্ষতা, সেবার মানসিকতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা তুলে ধরেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীণ প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত সুন্দর পালের আদর্শনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং জনসেবায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে— এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু স্বামীজীর ভাষায়, মানুষের জীবনে এমন কিছু দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া উচিত, যা তাঁকে মানুষের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় করে রাখে। সুন্দর পাল তাঁর কর্মময় জীবনের মধ্য দিয়ে সেই দাগ রেখে গিয়েছেন।'

তিনি আরও বলেন, হিন্দু দর্শনে আত্মাকে অবিনশ্বর বলে মনে করা হয় এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করা হয়। স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' গ্রন্থের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুন্দর পালের আত্মা বেঁচে রয়েছে এবং নতুন রূপে ফিরে আসবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘের সাংগঠনিক বিস্তারের উদ্দেশ্যেই সুন্দর পাল প্রচারক জীবনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই এই অঞ্চলে সঙ্ঘের কাজের আরও বিস্তার ঘটানোই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রয়াত প্রচারকের আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। পরিশেষে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার সমাপ্তি ঘটে। □